ঊনিশের পঞ্চাশ

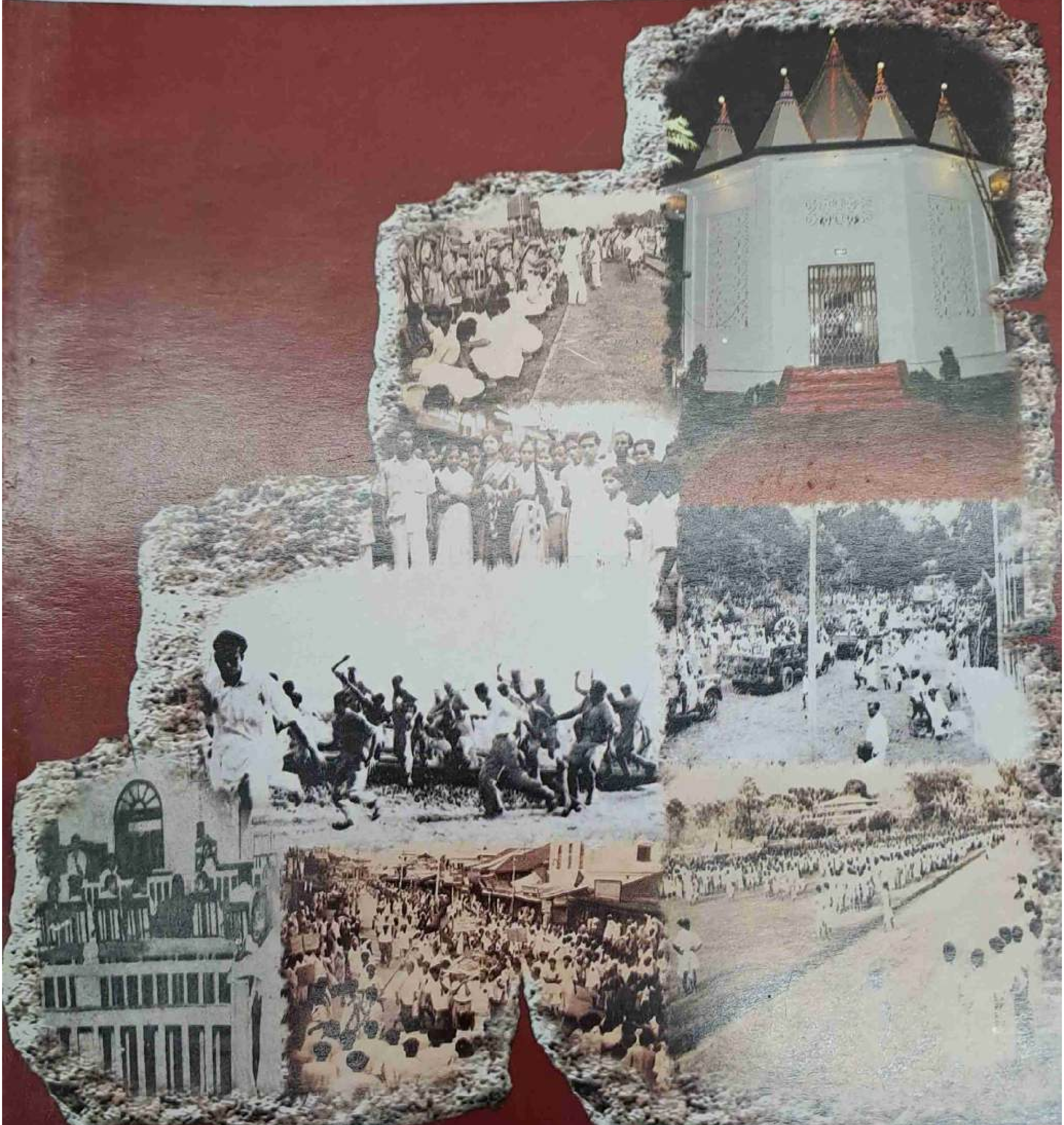

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কাছাড় জেলা সমিতি

উনিশের পঞ্চাশ

১৩৬৮ — ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

১৯৬১ — ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

ভাষা শহিদ স্মারক সংকলন গ্রন্থ

সম্পাদক

গৌতম প্রসাদ দত্ত

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কাছাড় জেলা সমিতি

বঙ্গভবন, শিলচর

উনিশের পঞ্চাশ
UNISHER PANCHASH
(A Collection of writings and documents)

সম্পাদনা সমিতি : গৌতম প্রসাদ দত্ত (আহ্বায়ক), যোগাযোগ : ০৯৪০১৫৯৪৯২৪
ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, সঞ্জীব দেবলস্কর, তুষারকান্তি নাথ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : পুণ্যপ্রিয় চৌধুরী, করুণা সিনহা, **অলঙ্করণ :** প্রদীপ শব্দকর

প্রকাশ : ২০১১ মে # ১৪১৮ জ্যৈষ্ঠ

মুদ্রণ : শিলচর সানগ্রাফিক্স, উল্লাসকর দত্ত সরণি, শিলচর - ৭৮৮০০১

প্রকাশক : দীপক সেনগুপ্ত, সম্পাদক, কাছাড় জেলা সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
বঙ্গভবন, অরুণকুমার চন্দ রোড, শিলচর - ৭৮৮০০১

মূল্য : ১০০ টাকা

এই সংকলনে প্রকাশিত বিভিন্ন মতামত সম্পূর্ণভাবে লেখকের। প্রকাশক, সম্পাদক কিংবা সম্পাদকমণ্ডলী এর জন্য দায়ী নন। অনুমতি ব্যতিরেকে এই সংকলনের কোন লেখা বা রচনার কোন অংশবিশেষ প্রকাশ নিষিদ্ধ।

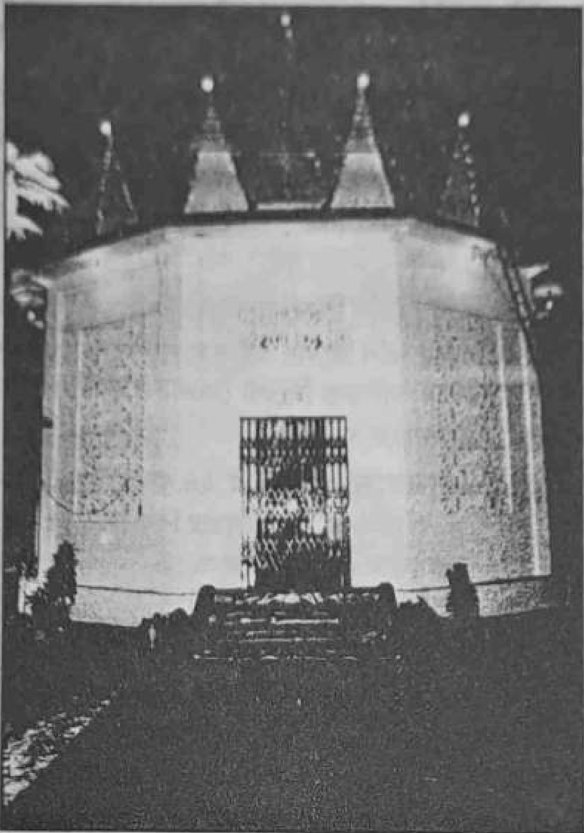

দশটি ভাই চম্পা আর একটি
পারুল বোন,
কলজে ছিঁড়ে লিখেছিলো
এই যে ঈশান কোণ্।
কোন্ ভাষাতে হাসে কাঁদে
কান পেতে তা শোন্।
শুনলি না? তো এবার এসে কুচক্রীদের ছা
তিরিশ লাখের কণ্ঠভেদী আওয়াজ শুনে যা,
বাংলা আমার মাতৃভাষা
ঈশান বাংলা মা।

— শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

শহিদ পরিচিতি

কমলা ভট্টাচার্য : ভারতের বাংলা ভাষা সংগ্রামের একমাত্র মহিলা শহিদ কমলা ভট্টাচার্য। ১৬ বছর বয়সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েই তিনি ভাষা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পিতৃহীন কমলা ভাই রামরমণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে শিলচরের বিলপারে থাকতেন। তিন ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় বোন। দেশ বিভাগের বলি হয়ে ১৯৫০ সালে কমলা ভট্টাচার্যের পরিবার কাছাড়ে আসেন।

শচীন্দ্র পাল : শচীন্দ্র পাল ১৯ বছর বয়সে শিলচরের কাছাড় হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েই ভাষা সংগ্রামে যোগ দেন। তিনি ছিলেন এই শহরের প্রয়াত গোপেশচন্দ্র পালের দ্বিতীয় ছেলে। দেশ বিভাগের সময় অবিভক্ত সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার নবীগঞ্জের নন্দনপুর গ্রাম থেকে তারা কাছাড়ে চলে আসেন।

হিতেশ বিশ্বাস : বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম শুরু হতেই ২৪ বছর বয়সে তিনি তাতে যোগ দেন। সিলেট জেলার হবিগঞ্জের বাসিন্দা প্রয়াত হরিশচন্দ্র বিশ্বাসের বড় ছেলে হিতেশ দেশভাগের সময় মা ও ভাই-বোনের সঙ্গে এদেশে চলে আসেন। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি শিলচর অম্বিকাপট্টির ভগ্নিপতির বাড়িতে থাকতেন।

চণ্ডীচরণ সূত্রধর : পেশায় কাঠমিস্ত্রি চণ্ডীচরণ সূত্রধর ভাষা আন্দোলন শুরু হতেই ২২ বছর বয়সে তাতে সামিল হন। সে সময় তিনি শিলচরের রাঙ্গিরখাড়ি অঞ্চলে থাকতেন। সিলেট জেলার হবিগঞ্জের জাকরপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত চিন্তাহরণ সূত্রধরের পুত্র চণ্ডীচরণ দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে মামা সুরেন্দ্র সূত্রধরের সঙ্গে শিলচর এসেছিলেন।

সত্যেন্দ্র দেব : শিলচর জানিগঞ্জের একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সত্যেন্দ্র দেব ২৪ বছর বয়সে ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে তিনি মা ও তিন বোনের সঙ্গে এ দেশে চলে আসেন।

বীরেন্দ্র সূত্রধর : পেশায় কাঠমিস্ত্রি বীরেন্দ্র সূত্রধরও ২৪ বছর বয়সে নেতৃত্বের আহ্বানে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সিলেট জেলার নবীগঞ্জের বাসিন্দা নীলমণি সূত্রধরের ছেলে বীরেন্দ্র দেশভাগের পর বাবা-মায়ের সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন।

কুমুদরঞ্জন দাস : শিলচর তারাপুরের এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কুমুদরঞ্জন দাস। ১৯ মে সত্যাগ্রহী হিসেবে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। দেশভাগের সময় সিলেট জেলার মৌলবীবাজারের জুরি থেকে তিনি পিতা কুঞ্জমোহন দাস ও মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন।

সুনীল সরকার : পেশায় ছোট ব্যবসায়ী সুনীল সরকারও ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে তাতে সামিল হন। দেশভাগের পর বাবা সুরেন্দ্র সরকারের পরিবারের অন্যদের সঙ্গে তিনি ঢাকার মুন্সিবাজারের কুমারপাড়া থেকে শিলচর চলে আসেন।

তরণী দেবনাথ : বয়ন ব্যবসায়ী তরণী দেবনাথ ২১ বছর বয়সে ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশভাগের সময় বাবা যোগেন্দ্র দেবনাথ সহ অন্যদের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শ্যামনগর থেকে শিলচর চলে আসেন। থাকতেন রাঙ্গিরখাড়ি অঞ্চলে।

সুকোমল পুরকায়স্থ : করিমগঞ্জের বাগবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জীবচন্দ্র পুরকায়স্থের পুত্র সুকোমল পুরকায়স্থ ডিব্রুগড় শহরে ব্যবসা করতেন। ১৯৫৯ সালে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে উৎপীড়িত হয়ে ওখান থেকে পালিয়ে আসার পর অবিভক্ত কাছাড়ে শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলন। তিনি নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার তাড়নায় ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

কানাইলাল নিয়োগী : রেলের কর্মচারী কানাইলাল নিয়োগী ৩৭ বছর বয়সে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সহযোগী হয়েছিলেন। ময়মনসিং জেলার খিলদা গ্রামের প্রয়াত দ্বিজেন্দ্রলাল নিয়োগীর পুত্র কানাইলাল চাকরিসূত্রে শিলচর থাকতেন।

কমলা ভট্টাচার্য

শচীন্দ্র পাল

হিতেশ বিশ্বাস

চণ্ডীচরণ সূত্রধর

সত্যেন্দ্র দেব

বীরেন্দ্র সূত্রধর

কুমুদরঞ্জন দাস

সুনীল সরকার

তরণী দেবনাথ

সুকোমল পুরকায়স্থ

কানাইলাল নিয়োগী

১৯শের ভাষা শহিদ লহ প্রণাম

একষট্টির উনিশ মে শিলচর রেলস্টেশনে পুলিশি গুলি ও লাঠিচার্জে গুরুতরভাবে আহত সত্যাগ্রহীরা

১. অঞ্জলি রাণী দেব (১৩) ছাত্রী -- মেহেরপুর, শিলচর
২. অনিল চন্দ্র দাস (২২) রিকসা চালক -- শুটকি পট্টি, শিলচর
৩. কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস (২৫) কাঠমিস্ত্রি -- রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর
৪. গোবিন্দ চন্দ্র দাস (১৮) বেকার যুবক -- টিকরবস্তি, শিলচর
৫. গৌরী বিশ্বাস (২৪) প্রাইভেট টিচার -- অম্বিকাপট্টি, শিলচর
৬. ছায়া রাণী দেব (২১) ছাত্রী -- অম্বিকাপট্টি, শিলচর
৭. জীতেন্দ্রকুমার দেব (২০) কারখানা শ্রমিক -- লক্ষীপুর রোড, শিলচর
৮. জ্যোতিষ কুমার ভট্টাচার্য (১২) ছাত্র -- রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর
৯. দিপালী দে (১৪) ছাত্রী -- পানির কল রোড, শিলচর
১০. ধীরেন্দ্র কুমার দেব (৩০) ব্যবসায়ী -- তুলাপট্টি, শিলচর
১১. নিরোদ চন্দ্র বর্মণ (২৫) ব্যবসায়ী -- টিকরবস্তি, শিলচর
১২. নিশিথেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৬) ছাত্র -- টিকরবস্তি, শিলচর
১৩. প্রদীপ কুমার দত্ত (১৮) ছাত্র -- অম্বিকাপট্টি, শিলচর
১৪. প্রদ্যুম্ন কুমার চক্রবর্তী (৩৮) প্রাক্তন সৈনিক -- তারাপুর, শিলচর
১৫. বিধানচন্দ্র রায় (১৯) ছাত্র -- সেন্ট্রেল রোড, শিলচর
১৬. বীরেন্দ্র কুমার রায় (১৯) ব্যবসায়ী -- জানিগঞ্জ, শিলচর
১৭. ভূপেন্দ্র কুমার পাল (২৭) কাঠমিস্ত্রি -- তারাপুর, শিলচর
১৮. মতিলাল পাল (১৮) ছাত্র-- পানপট্টি, শিলচর
১৯. মনোরঞ্জন সরকার (১৮) দোকান কর্মচারী -- ইটখলা, শিলচর
২০. মানিক মিঞা লস্কর (১৮) দর্জি -- বরজুরাই, বেরেঙ্গা, শিলচর
২১. যামিনীমোহন নমঃশূদ্র (৪০) ব্যবসায়ী -- তারাপুর, শিলচর
২২. রজনী মালাকার (৪০) দিনমজুর -- নিউকলোনি, শিলচর
২৩. রঞ্জিত সরকার (১৯) ছাত্র -- তারাপুর, শিলচর
২৪. রাম চন্দ্র দাস (২৫) রিকশা চালক -- দাস কলোনি, শিলচর
২৫. রেণুকণা সরকার (৩৫) গৃহবধু -- অম্বিকাপট্টি, শিলচর
২৬. সন্তোষ চন্দ্র কীর্তনিয়া (২৬) কাঠমিস্ত্রি -- দেশবন্ধু রোড, শিলচর
২৭. সীতা দে (১৮) ছাত্রী -- অম্বিকাপট্টি, শিলচর
২৮. সুবিনয় ধর (২৯) দর্জি -- নাজিরপট্টি, শিলচর
২৯. শ্যামলকান্তি গুপ্ত (২৪) দোকান কর্মচারী -- শিলচর
৩০. হারাণ মন্ডল (৪০) দিনমজুর -- তারাপুর, শিলচর

এছাড়া শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি শহর সহ তৎকালীন অবিভক্ত কাছাড়ের তিন মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশি সন্ত্রাস ও অত্যাচারে আহত, নির্যাতিত ও বিকলাঙ্গ হয়েছেন অগণিত সত্যাগ্রহী, যাদের নাম নথিভুক্ত কিংবা নথিবদ্ধ হয়নি। এদের সংখ্যা ও নাম পরিচয় নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

মুখবন্ধ

একাদশ ভাষা শহিদের রক্তে লেখা ১৯ মে বাঙালির ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ১৯৬১ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বাংলাভাষার বেদিমূলে আত্মবিসর্জনের বিনিময়ে বরাক উপত্যকায় মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আমরা পেয়েছি। ভাষা শহিদের আত্মবলিদান পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ভাষিক গোষ্ঠী — বোড়ো, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, মণিপুরি, ডিমাছা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামেও অনুপ্রেরণা দিয়েছে । শুধু এই অঞ্চলই নয়, বরাক উপত্যকার সংগ্রামের প্রভাব পড়েছে ঝাড়খণ্ড, বিহার, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, আন্দামান সহ বিভিন্ন রাজ্যের বাংলাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে। একসময় কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে ১৯ মে ব্রাত্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেখানেও ১৯ মে আলোচিত।

এবার ভাষা সংগ্রামের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ১৯ মে ৫১তম ভাষা শহিদ দিবস। আমরা শহিদ স্মৃতিতর্পণ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। ভাষা শহিদের উত্তরাধিকার বহন করে তাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে কতটুকু যত্নবান -- সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আত্মবিশ্লেষণ আবশ্যক বোধ করি। শুধুমাত্র শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান পালনেই দায় শেষ হয়না। শহিদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অধিকার রক্ষায় কতটুকু সচেতন ? দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষার প্রয়োগ আমরা কতটুকু করছি ? সরকারি দপ্তরে বরাক উপত্যকার অভ্যন্তরে বাংলাভাষার তেমন ব্যবহার কেন করছি না এবং এর দায় কার ? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তো আমাদের সবাইকে দিতে হবে। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে বাংলা না পড়লে দায়ী তো অভিভাবক। অতএব ভাষা শহিদের রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য, মাতৃভাষার অবাধ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার পক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকারই হবে যথার্থ।

ভাষা-সংস্কৃতির অধিকার এবং অস্তিত্ব রক্ষায় সচেতন থেকে প্রত্যেকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেই শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সার্থক হবে।

নীতিশ ভট্টাচার্য
সভাপতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কেন্দ্রীয় সমিতি

প্রাক্‌কথন

ভাষা মানুষের অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠার আয়ুধ, চেতনা, আত্মোপলব্ধি, মননচর্চা, বিচার-বিশ্লেষণ, শিক্ষা-দীক্ষা, বীক্ষণ -- সর্বোপরি সামগ্রিক সত্তার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশের গৌরববোধ মানুষের সহজাত। মাতৃভাষা নিয়ে আবেগতাড়িত হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু একাধিক কারণে মাতৃভাষার ঐতিহ্যের দীপ্তি প্রোজ্জ্বল রাখার ক্ষেত্রে বঙ্গভাষী মানুষের প্রত্যয়-প্রতীতি ও চৈতন্যবোধে প্রভাব ফেলেছে ভাষাশহিদের রক্তে রাঙানো পুণ্যভূমিতে। বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষার মর্যাদারক্ষার সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে চিন্তাচর্চা কম হয়নি। তবুও মাতৃভাষার দীপশিখা অনির্বাণ রাখার দৃঢ় অঙ্গীকারও আজ নিষ্প্রভ, অকিঞ্চিৎকর। আরোপণ ও আগ্রাসনের পাশাপাশি আত্মবিস্মৃতির বিষবাষ্পে বাংলাভাষা বিবর্ণ, বিপন্ন বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯শে-র উত্তরাধিকার এখন প্রভাতফেরী, মাল্যদান, ইতিউতি নাচগান-কবিতা ও সাম্বৎসরিক প্রায় একই বয়ানের বক্তৃতায় সীমায়িত। ১৯শে মে পার হলেই ১৯ হারিয়ে যায়। উত্তরাধিকার লালনের-বহনের দৃপ্ত চেতনার অভাব বড়ই প্রকটিত। মাতৃভাষা-চেতনায় দৈন্য অতি হৃদয়বিদারক। এই প্রবণতা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে একাদশ ভাষা শহিদদের স্মৃতিধন্য বরাকের মাটিতে। আহরণে মানুষ সমৃদ্ধ হয় কিন্তু আরোপণে আক্রান্ত হয় স্বাধিকার।

এদিকে, বরাক উপত্যকায় আমাদের আত্মপরিচয় রক্ষার গৌরবময় সংগ্রাম পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করল। একষট্টির রক্তস্নাত ১৯ মে এই অঞ্চলের আমজনতাকে যে পথনির্দেশ দিয়েছিল গত পাঁচ দশকে সেই পথে পা মেলানোর সংগ্রাম বারবারই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। তবু প্রবল আত্মবিশ্বাসের জেরে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এগিয়ে চলেছেন উপত্যকাবাসী। এটা সত্যি, ভাষাচর্চা এবং বিকাশের জন্য স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে উনিশ মে সততই প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

স্বাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে আরও প্রবল করে তোলার জন্য বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতি এবার এক বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। বাঙালির আত্মপরিচয় রক্ষার গৌরবগাঁথা উনিশের আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এ অঞ্চলের বোদ্ধাজন দ্বারা এক বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও সেই দুনিয়া কাঁপানো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং নানা ঘটনাবলীকে লিপিবদ্ধ করে একটি বিশেষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে বরাক বঙ্গের কাছাড় জেলা সমিতি। আমি মনে করি এই স্মাকরগ্রন্থটি গবেষক এবং আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যনির্ভর দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে। এতে সন্নিবেশিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি আমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আরও তেজি করে তুলতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

তৈমুর রাজা চৌধুরী
সভাপতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কাছাড় জেলা সমিতি

সম্পাদকীয়

মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার অধিকারকে পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই মেনে নিয়েছে। আমাদের সংবিধান প্রণেতারাও বিষয়টি এড়িয়ে যাননি। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে উগ্র জাতীয়তাবোধ লালিত শাসককুল এ দেশের বহুভাষিক চরিত্রকে ক্ষমতার গর্বে অস্বীকার করতে চেয়েছে বারবার। আসামের চিত্রটি এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কদর্য। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেই এ রাজ্যকে একভাষী করার প্রবণতার সূচনা ঘটেছিল। সাতচল্লিশের পর রাষ্ট্রক্ষমতাকে হাতিয়ার করে তা বহুমাত্রিক রূপ নেয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পদদলিত করে প্রণালীবদ্ধ তৎপরতা রাজ্যের ভাষিক চরিত্রকে বদলে দিতে চেয়েছিল।

বরাক উপত্যকার মানুষ প্রতিবাদে গর্জে উঠে সেদিন। ভাষা সম্প্রসারণবাদীদের প্রতিরোধ করে দাঁড়ায় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। একষট্টির ১৯ মে একাদশ শহিদ ও তাদের সঙ্গীদের রক্তস্নানে হোঁচট খায় এ রাজ্যকে একভাষী রাজ্য হিসেবে তুলে ধরার নীল নক্সা। ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার অধিকার রক্ষায় রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে যে সংগ্রাম অঙ্কুরিত হয়েছিল এই জনপদে পঞ্চাশ বছর ধরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তা আজও চালিয়ে যেতে হচ্ছে। রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষে ১৯শে-র পঞ্চাশ বছর পূর্তির সময়ে সেই সংগ্রাম এসে দাঁড়িয়েছে বাঁকের মুখে। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব নিকেশ আত্মানুসন্ধানের তাগিদকে বাড়িয়ে তুলেছে। আর এখানে দাঁড়িয়েই একষট্টির সংগ্রামের আরো এক বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই সংগ্রামের সূচনা হয় তা শুধু বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার নয়, অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামকেও উজ্জীবিত করেছে। তাই আগামী দিনে এই অঞ্চলের ভাষা-সংস্কৃতি-শিক্ষা এবং আর্থিক স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রাম কোন পথ ধরে এগোবে তাও সূত্রায়িত করবে এই পর্যালোচনা।

এই গ্রন্থে যেসব বিশিষ্ট চিন্তকদের সেইসব লেখা সংকলিত হয়েছে যা ১৯শের ভাষা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট, বিস্তারপর্ব এবং বর্তমান সংকটের স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা নিতে সহায়ক হবে। পরিশিষ্ট অংশে ১৯শের সংগ্রাম পর্যালোচনায় প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য প্রতিবেদনও তুলে ধরা হয়েছে।

ভাষা সংগ্রামের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের কাছে এই সংকলন গ্রন্থটি যদি সমাদৃত হয় তাহলে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির প্রয়াস সার্থক হতে পারে।

গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশনায় বিশেষভাবে সহায়তা করার জন্য সম্পাদনা সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী, সম্পাদক দীপক সেনগুপ্ত, সম্মেলনের গবেষণা পর্ষদের আহ্বায়ক তুষারকান্তি নাথ এবং শিলচর সানগ্রাফিক্সের কর্ণধার পুণ্যপ্রিয় চৌধুরী ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গৌতম প্রসাদ দত্ত

সূচিপত্র

- মধ্যযুগে কাছাড়ের সরকারি ভাষা ❖ ডঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য ॥ ১৫
- আসামের ভাষা সমস্যা : উৎস ও পটভূমি ❖ সুজিৎ চৌধুরী ॥ ২২
- একষট্টির ভাষা সংগ্রাম ❖ পরিতোষ পালচৌধুরী ॥ ৩৩
- ভাষা সংগ্রামের চেতনা ও আমাদের উত্তরাধিকার ❖ ইমাদ উদ্দিন বুলবুল ॥ ৪০
- মেহরোত্রা কমিশনে সাক্ষীদের বয়ান ❖ অরিজিৎ চৌধুরী ॥ ৪৭
- ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : প্রাসঙ্গিক বিষয় ❖ আবুল হোসেন মজুমদার ॥ ৫৫
- অস্তিত্বের সংকট ও আমাদের আত্মানুসন্ধান ❖ অনুরূপা বিশ্বাস ॥ ৬১
- চেতনার জাগরণ ❖ সুবীর কর ॥ ৬৫
- উনিশের চেতনা ও বরাকের বাংলা কবিতা ❖ তুষারকান্তি নাথ ॥ ৬৮

পরিশিষ্ট

- কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ ও দিল্লির দরবার ॥ ৭৩
- এন সি চ্যাটার্জি বেসরকারি তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন ॥ ৭৮
- লালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিবৃতি ॥ ৮২
- বিমলাপ্রসাদ চালিহার বিবৃতি ॥ ৮৫
- শাস্ত্রী সূত্র, সরকারি প্রতিশ্রুতি ও তার প্রয়োগ ॥ ৮৯
- আসাম ভাষা আইনে বরাকের প্রাসঙ্গিক অংশ ॥ ৯৩
- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা : একটি অবলোকন ॥ ৯৫
- উনিশে মে সম্পর্কিত ক্যাসেট ও তথ্যচিত্র প্রকাশনা ॥ ১০৬

লেখক পরিচিতি

জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য	ঃ	সমাজ গবেষক, অনেকগুলো গবেষণা গ্রন্থের প্রণেতা ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য।
সুজিৎ চৌধুরী	ঃ	ভাষা-আন্দোলন-পরবর্তী পর্বের অন্যতম ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, লোকসংস্কৃতিবিদ এ লেখক একই সঙ্গে আবার বরাক উপত্যকার ভাষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় যোদ্ধাও।
পরিতোষ পালচৌধুরী	ঃ	একষট্টির ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, বিশিষ্ট লেখক, অনেকগুলো গ্রন্থের প্রণেতা, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী।
ইমাদউদ্দিন বুলবুল	ঃ	লেখক, আইনজীবী ও সমাজকর্মী।
অরিজিৎ চৌধুরী	ঃ	গল্পকার ও লেখক।
আবুল হোসেন মজুমদার	ঃ	সমাজ গবেষক, লেখক ও সমাজকর্মী।
অনুরূপা বিশ্বাস	ঃ	কবি, লেখিকা ও অনেকগুলো গ্রন্থের লেখিকা।
সুবীর কর	ঃ	ভাষা আন্দোলনের গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও লেখক।
তুষারকান্তি নাথ	ঃ	সমাজ-সংস্কৃতির গবেষক ও অনেকগুলো গ্রন্থের লেখক।

মধ্যযুগে কাছাড়ের সরকারি ভাষা

জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য

বরাক উপত্যকায় বাঙালির বসতি এবং বাংলা চর্চা সুপ্রাচীনকালের। লেখক ইতিহাসের নানা তথ্য ও উদ্ধৃতি তুলে ধরে এখানে দেখিয়েছেন, ডিমাসা রাজারা স্থানীয় জনবিন্যাসের চরিত্র মেনে নিয়েই বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাদের আমলে সরকারি কাজকর্মের ভাষা ছিল বাংলা। আহোম সরকারের সঙ্গে চিঠি বিনিময় এবং বহিঃসংযোগও বাংলা ভাষাতেই হত। ১৮৩২ সালে কাছাড়কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার ঘোষণাপত্রটিও জারি হয়েছিল বাংলা ভাষায়ই।

রাজসভায় বা রাজ্যশাসনে ব্যবহৃত ভাষাকেই অতীতে বলা হতো রাজভাষা বা সরকারি ভাষা। এই সরকারি ভাষা কিন্তু মূলতঃ মাটির ভাষা, অর্থাৎ স্থানীয় মানুষের ভাষা। বাইরে থেকে কোথাও এসে যারা রাজ্য স্থাপন করেছেন তারাও স্থানীয় মানুষের ভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। রাজভাষা হিসেবে। সমতল কাছাড়ের মানুষ ছিলেন বাংলাভাষী। বস্তুত সমস্ত বরাক উপত্যকায় বাঙালিদের বসতি এতই পুরনো যে এখানে ওরা কখন প্রথম এসেছিলেন সে সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। অথচ এই অঞ্চলের অতীত ইতিহাস যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ভারত-আর্য গোষ্ঠী যাদের বর্তমান প্রজন্ম এখানকার বাংলাভাষী মানুষ তারা বরাবরই এখানে ছিলেন। কখন এসেছিলেন সে কথা ইতিহাসে নেই।

তিন দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা সমতল কাছাড় বা বরাক উপত্যকার স্বাভাবিক ভৌগোলিক যোগসূত্র ছিল শুধু শ্রীহট্ট ও প্রতিবেশী পূর্ববঙ্গের সঙ্গে। সেদিক থেকেই ভারত-আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন এই উপত্যকায়। এখানকার গ্রাম, নদী বা পাহাড়ের নাম তাই প্রতিবেশী বাংলাভাষী অঞ্চলের গভীর সাদৃশ্য বহন করছে। ভৌগোলিক কারণেই প্রাচীনকালে কাছাড় -শ্রীহট্ট সহ সমগ্র বরাক-সুরমা উপত্যকা নিয়ে ছিল 'শ্রীহট্ট মণ্ডল' বা 'শ্রীহট্ট রাজ্য'। এই উপত্যকায় বর্ণাশ্রম ধর্মও ভারত-আর্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য রয়েছে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন তাম্রশাসনে। শ্রীহট্টের প্রাচীন তাম্রশাসনে বর্তমান কাছাড় ও করিমগঞ্জের অনেক গ্রামের উল্লেখ এই সত্যই প্রমাণ করছে [১]।

মধ্যযুগে সমতল কাছাড় পর্যায়ক্রমে ত্রিপুরা, খাসপুর ও হেড়ম্ব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হেড়ম্ব রাজ্যের ডিমাছা রাজারা প্রথমে মাইবাং থেকে উত্তর কাছাড় সংলগ্ন সমতল কাছাড়ের কিছু অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে খাসপুর রাজ্য তাদের অধিকারে চলে যাবার পর ডিমাছা রাজধানী মাইবাং থেকে খাসপুরে স্থানান্তরিত হয়। মাইবাং থেকেই ডিমাছা রাজারা বাংলাভাষার ব্যাপক ব্যবহার চালু করেছিলেন। ভুবনেশ্বর বাচস্পতির মত মহান কবি মাইবাং-এর রাজসভা অলংকৃত করেছেন। রাজদরবারে 'নারদীয় রসামৃত'ও 'ব্রহ্মপুরাণ'-এর বাংলা অনুবাদ হয়েছে [২]। পরবর্তীকালে খাসপুরের ডিমাছা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র বাংলা ভাষায় কবিতা ও গান রচনা করেছেন [৩]। ডিমাছা কবি চন্দ্রমোহন বর্মণের বাংলা কবিতা সেই যুগে খুবই লোকপ্রিয় ছিল [৪]।

রাজকার্যেও বাংলা ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হয় মাইবাং থেকে। মহারাজ মেঘনারায়ণের ১৪৯৮ শকাব্দের (১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ) দু'খানি প্রস্তরফলক তার প্রথম নিদর্শন [৫]। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র ১৬৫৮ শকাব্দে (১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দ) বড়খলার মণিরাম লস্করকে উজির নিয়োগ করে দু'খানি সনন্দ প্রদান করেন। এই সনন্দ দু'খানিও লেখা হয়েছিল বাংলা ভাষায় [৬]। এই বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের শাসনের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলা ভাষায় প্রথম আইন প্রণয়ন করেন মহারাজ তাম্রধ্বজ নারায়ণ। ১৭৩৮ শকাব্দে (১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ) আরও একখানি দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র। এই আইন পুস্তক দু'খানি একত্রে সংকলনও প্রকাশ করেন পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ [৭]।

দানপত্র, নিয়োগপত্র এবং অভয়পত্রও লেখা হতো বাংলা ভাষায়। উদাহরণ হিসেবে আমরা কয়েকখানা দলিলের উল্লেখ করছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১৩ শকাব্দে (১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ) কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে হাইলাকান্দিতে কিছু 'জঙ্গলা' অঞ্চল আবাদ করে সেখানে লোকবসতি করাতে আদেশ দিয়েছিলেন। এই অভয়পত্রের ভাষা ছিল বাংলা [৮]। আবার ১৭৩৪ শকাব্দে (১৮১২ খ্রিস্টাব্দ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আত্মারাম ভট্টাচার্যকে কালাইন পরগণার কিছু জমি ব্রহ্মত্র হিসাবে দান করেছিলেন। এই দানপত্রও লেখা হয়েছিল বাংলা ভাষায় [৯]। মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র ১৭৪৬ শকাব্দে (১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ) উধারবন্দের বাসিন্দা সোনারাম শর্মাকে উধারবন্দ ও বাঁশকান্দি মৌজার দেশমুখ্য হিসাবে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগপত্রও লেখা হয়েছিল বাংলাভাষায় [১০]। শকাব্দের পাশাপাশি বাংলা সন ব্যবহৃত হতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে এই দেশমুখ্যের নিয়োগপত্রের কথা। এখানে লেখা আছে, ''তারিখ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৩১ সালে বাঙ্গালা মোতাবকে ১৭৪৬ শকাব্দা।''

বহিঃসংযোগের ভাষাও ছিল বাংলা। কাছাড়ের শেষ দুই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারকে চিঠিপত্র লিখেছেন বাংলা ভাষায়। সুরেন্দ্রনাথ সেন সংকলিত ''প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন'' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২) নামক পুস্তকে কৃষ্ণচন্দ্রের ১৩ খানা ও গোবিন্দচন্দ্রের ১৬ খানা চিঠি রয়েছে কাছাড়ের ইতিহাসের অমূল্য দলিল হিসেবে। ব্রিটিশ সরকারও এই অঞ্চলের ভাষা সঠিক চিহ্নিত করেছিলেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মার্চ (১২৩০ বাঙ্গালা ২৪ ফাল্গুন) তারিখে মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে গভর্নর জেনারেলের পক্ষে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মূল বয়ান ছিল বাংলা ভাষায় [১১]। আবার ১২৩৮ বাংলার ২৪শে আষাঢ় (১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে টোমাস ফিসার কাছাড়কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে যে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র জারি করেছিলেন তাও ছিল বাংলা ভাষায় [১২]।

আহোম সরকারের সঙ্গেও চিঠি-বিনিময় হতো বাংলা ভাষায়। ডঃ সূর্যকুমার ভূঞা সম্পাদিত ''কছারী বুরঞ্জী'' (গৌহাটি, ১৯৩৬) ও 'তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী'' (গৌহাটি, ১৯৩২) এর প্রমাণ। এই বুরঞ্জী দু'খানাতে উভয়পক্ষে লেখা কয়েকখানি চিঠি সংযোজিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা আধুনিক বাংলা হরফে চার-পাঁচখানা চিঠির পূর্ণ বয়ান তুলে ধরছি। প্রথম চিঠিখানা স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের রাজত্বকালের। ১৬২৭ শকাব্দে (১৭০৫ খ্রিস্টাব্দ) দুয়ারা

বরফুকনকে লিখছেন কাছাড়ি রাজা (সম্ভবতঃ তাম্রধ্বজ নারায়ণ)—

"আর ঙদেবর কুশল, তোমার কুশলাভ্যুদয় সদা পরিচিন্তি। আর সমাচার এই,- পূর্বাপরাবধি যেমত বিধ প্রীতি আছিল সেই প্রীতির নিমিত্ত উকিল তারে তুমিও জান। আর মধ্যে উকিল পঠাইছিলাম, তা তো দোষ দিলা মৃতকর পত্র লৈয়া আসিছে করিয়া। আর ঁদেবর নাজানিছিলাম সে মৃত্যু হৈছে। আর এই কারণ ঁদেবে পত্র উকিল অনাদর করিলা। আর সেই অবধি ঁদেবে উকিলো নাপঠাই। আর তোমার দেশর উকিলপত্রও না আইছে। আর অদ্যাবধি অভেদ প্রীতি আছে। সেই প্রীতির নিমিত্তে উকিল তোমার দেশত আসিছে, ঁদেবে উকিলপত্র ও পঠাইছে। আর এমত বিধ করিবার যে দিনের্দ্দিন আধিকারিক প্রীতি বাঢ়িতে যাই। আর বিশেষ কি লেখিম আপনি সমস্তে জান। আর যে সমাচার হয় তারে করাইবা, লীলাবর গন্ধর্ব্বরায় প্রমুখে জানিবা। আর তোমার নিমিত্তে পত্র-সন্দেশ, কাম্বলি ৪ খান, জাইফল ২ মোনা, চন্দন ২ মোনা, পাটী ১টা।"

(কছাড়ী বুরঞ্জী, পৃঃ ১২১)

স্বর্গদেব কমলেশ্বর সিংহের রাজত্বকালে আসামে যখন মোয়ামারীয়া বিদ্রোহ চলছিল তখনও দুই রাজ্যের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গদেব কমলেশ্বর সিংহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখছেন,

"বিশের সমাচার এহি, আমার দেশ বিভ্রাটকালে শত্রু- পরাভবত থাকি দেশস্থ প্রাণীসকল ভাগি গৈয়া বরমূরা এবং ভগনীয়া প্রজা ও মোয়ামরীয়া আপনে দেশতে সোমাই আছিল। সম্প্রতি ঈশ্বরর কৃপাত সেই শত্রু দমন করিয়া দেশ পাইছি, এবং আপনে দেশত ভাগি গৈ সোমাই থকা জনসকল পূর্বধর্ম্ম-কবুল চাইয়া শীঘ্রে আমার কটকী ফেদেলা ও বরা লখীরাম ইহার সঙ্গেতে ছারি দিতে হয়। তেবেতো পূর্ব্ব-পিতা- পুত্র সম্বন্ধ রক্ষা হয়, সকল ধর্ম্মে রক্ষা পায়। যদিস্যাৎ সেই বরমূরা এবং ভগনীয়া ও মোয়ামরীয়া ছারি দেয় না তবে যি হবে তাহা আপনে চাক্ষু দেখিবেন। আর পত্র-চিহ্ন দিতেছি, পশ্যিবেন। হাতী-দাঁতর ডাবেরে সোনর মলমা করা কটারী দুখান, রূপর মলমা করা দুখান, পিত্তলুয়া ৪ খান, মহর শিঙ্গর ডাবেরে উকা ২০ খান, রঙ্গা পাটর ধূতি ৪খান। ইতি- শক ১৭১৭ , মাস আঘ্রন, তেরিখ (৫)।"

(তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী, পৃঃ ১৩৭)

কাছাড়ের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য,

"বিশেষঃ যখন গার মধ্য হইতে শ্রীরুদ্রসিংহ ঁএ রাজা তাম্রধ্বজক উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রী বিশ্বনাথ ক্ষেত্রে দক্ষিণ উরুতে শ্রীশিবসিংহ মহারাজকে বৈসায়া ও রাজা তাম্রধ্বজক বাম উরুতে বৈসায়া পিতাপুত্র সম্বন্ধ সত্যধর্ম্ম করিয়াছিল, তদবধি- উভয় দেশ- জভেদানুবৎচিহ্ন প্রীতি পূর্বকমতে গঙ্গাস্রোত চলি গেছেন। তদনুরূপ ভাব-ভাবনা অন্তস্করণেতে আছে, কিন্তু দেশকাল সম্যতারূপে নাচলেন। অতএব পূর্বব্যবহারাদি বিপর্যয় কিঞ্চিৎ হৈয়া থাকিবে। তত্রাপি মমান্তস্করণীয় পত্রী দ্বারা বেদ্য হৈয়া কালাকালক্ষণ করিয়া প্রসাদ হৈতে পাই। অতএব মম ধর্মপুর দেশীয় কিয়ৎলোক শ্রীমদান্ধ হৈয়া অকার্য করিল। মমাজ্ঞা পল্লবকারণ আত্মপিতাপুত্র সম্বন্ধোভয় দেশ এক হৈল। ভদ্রাভদ্র জ্ঞাপন করিতে মমাভিমান চিত্তে নাই। মদীয়পত্রী প্রেরণা করিতেছি। আপনে ঙক জ্ঞাপন করিয়া মদীয় কিয়ৎ নরকীট শ্রীমদান্ধজ্ঞান পূর্ণ দুর করিয়া দিবেক, বিজ্ঞোত্তমেষু।"

(তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী, পৃঃ ১৩৮-৩৯)

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আসামের বরবরুয়াকে লিখছেন,

"পরং বিশেষ, স্থিতিমান্ শ্রীশর্ণামতি যোগে আপনে যে পত্র পঠায়াছিলাম তাহা সবিশেষ জ্ঞাত হইলাম। আপনে বরমূরীয়া গোহাঁই ও ভগনীয়ার বিষয় পত্রেতে লিখেন, যখন ৺র দেশ-বিভ্রাট-কালে ৺র সন্ততিবুলি পরিচয় দিলেন, সত্যাসত্য পরিচয় না পাই, তথাপি জীবিকার সংযোগ করিয়া রাখি। তদুপশচাৎ জয়সিংহ ৺মণিপুরেশ্বরে যখন আপনার দেশে গিয়াছিলেন উহান পুত্র অনুপানন্দ যুবরাজের সঙ্গে মিত্রতা করিয়াছিল। সেই সম্বন্ধানুসারে পত্র দিয়াতেই নিলেন। অকস্মাৎ কেমতরূপে যায়া এতদ্দেশীয় ও পূরণীয়া ভকত ও সামান্য লোকের সঙ্গে কুমন্ত্রণা করিয়া ৺ক যুদ্ধ করিল। তাহা শুনি আমাদের শ্রীফের্গা খুংলাঙ্গকে ওহাকে পাগুরি আনিতে পাঠাইলাম। একথা শুনি আমার শ্রীফের্গা খুংলাঙ্গকে অমর্যাদা করিয়া নটুয়া লস্কর প্রভৃতি কতকলোক কাটিলেন এবং রণে ভঙ্গ দিয়া অন্নে পীড়িত হৈয়া দেশান্তরী হৈল। ইতি, শক ১৭২৫, মাস জ্যৈষ্ঠ।"

(তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী, পৃঃ ১৬৪)

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে দুয়ারা বরবরুয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখছেন,

"পরং সমাচার এহি, শ্রীচেনা খুমডাঙ্গর মার্ফৎ আপনার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আর শ্রীশ্রী ৺র স্থানে পালসেবার হস্তি- ঘোঁরা সমেত যে পত্র প্রেরণ করিতেছিল শ্রী ৺র চরণারবিন্দেত শ্রীচেনা খুমডাং সহিত সাক্ষাত করা গেল। যে সময়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল শ্রীচেনা খুমডাঙ্গর মুখ জবানে জ্ঞাত হইবেন।। আর পত্রতে লেখিয়াছিলেন, - বরমূরা গোহাঁই এবং ভগনীয়ার বিষয় পহিলে এহি সম্বাদ পত্রে লেখিয়া ইঠানের শ্রীফে দেলা কটকীক সেখানে পাঠাইয়াছিলাম। সে সময়ো অপনে পত্রসমেত শ্রীফেলাই, শ্রীসাগরফা, শ্রী ফেদেলা কটকীর সঙ্গে পঠোয়া পত্রেও মুখ-জবানীয়ে এমত বলিয়াছিল, -'যখন ৺র দেশ-বিভ্রাট ছিল,তখন বরমূরা গোহাঁই ইখানে আসিছিল সত্যাসত্য পরিচয় না পাই জীবিকা সংযোগ করি রাখিয়াছিল। ইতিমধ্যে শ্রীমণিপুরী রাজার পুত্র অনুপানন্দে মিত্রতা সম্বন্ধানুসারে লেখা দিয়া মণিপুরে নিলেক। যদিস্যাৎ পুনর খাচপুরে। আসে তবে ধরিয়া দিয়া যাব।' এইরূপ পত্রেও মুখ-জবানেও কহিয়াছিল। সম্প্রতি সেরূপ বাক্য ছারা হৈয়া পত্রে লেখিয়াছেন,- 'বরমূরা গোহাঁই মণিপুর হৈতে আসিয়া এতদ্দেশীয় পূরণীয়া ভকত সামান্য লোকের সঙ্গে কুমন্ত্রণা করিয়া ৺কে যুদ্ধ করিল। তা শুনি আমাদের শ্রীফের্গাখুমডাঙ্গকে উহাকে পাকুরি আনাইতে পাঠাইলাম। একথা শুনি ফের্গাখুমডাঙ্গকে অমর্যাদা করি নটুয়া লস্কর প্রভৃতি কতটি লোক কাটিলেন; এবং রণে ভঙ্গ দিয়া অন্নে পীড়িত হইয়া দেশান্তরী হৈল।' এইরূপ আত্মদোষ গুপ্ত করিয়া যে লিখিয়াছেন অনুপযুক্ত নটুয়া লস্কর আদি যেমত কাটিয়াছে এবং বরমূরা পুত্র সমেত রণে ভঙ্গ দিয়া পলাই গৈই আছিল, তাহা সমস্ত জানিয়াছি। সম্প্রতি আপনে পূর্ববাক্য বিস্মরণ হৈয়া, পিতাপুত্র সম্বন্ধ, ৺ত ধর্ম্ম কবুল বিচ্ছেদ করিয়া দাসীসূত বরমূরাকে,মোয়ামরীয়া, ভগণীয়া প্রজা এবং কছারী সকলকে সম্মিলিত করাইয়া আমাদের ফৌজ সহিত যুদ্ধ করাইয়া ৺র যত অন্যথা কার্য করিয়াছেন, পত্রে লেখিতে পারি না। তথাচ পূর্বধর্ম্ম কবুল পিতাপুত্র সম্বন্ধেত থাকিয়া আমরা তাহার প্রতিকার করিবার মনস্থ নাই। অতএব পূর্ব্বপ্রীতি-ধর্ম্ম কবুল রক্ষা করিবার যদি আপনার মনোযোগ আছে, যেরূপ পুত্র-ভার্যা সহিত বরমূরা এবং ভগণীয়া প্রজা ও মোয়ামরীয়া এ সকল শীঘ্র পায়া যাই তাহা করিবেন। যদিস্যাৎ এরূপ বাক্যতে মনোযোগ না করেন ৺৺এ যি করাবে তাহা অবশ্য হৈবেক, নিশ্চয়

বুজিবেক। আর কলিত্তার শ্রীযুত বরচাহারের পরামর্শ করিলাই ভালমতে তদন্ত করি বুঝিবেক। দৈবচক্র বলবন্ত বটে, ইহাতে কেও বারণা করিতে নাপারে। এরূপ যে বলিয়াছেন শরীরী মাত্রকে দৈবাধীন। দৈবে যাহাকে যেহি করাবে সেহিসে হয়; ইহাতে মনুষ্যের কর্তব্যতা নাই। তথাচ ধর্ম প্রবর্ত্তাজনক কদাচ ৺ধর্ম্ম ছারে না। আর এই দোষ গুণ গ্রহণ করে, তবে পূর্ব্ব ৺এ ধর্ম্মক্ষেত্রেতে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ নির্বন্ধ রক্ষা হৈল না। ‘অতএব ৺আমাদের পিতৃ হৈল। পিতৃতে পুত্রর যদি অপরাধ হয় তথাপি পিতৃয়ে অপরাধ ক্ষমা করিতে উপযুক্ত।’এরূপ যে লেখিয়াছেন, আম্রা সে রূপ দোষ গ্রহণ করি নাই। যদিস্যাৎ গ্রহণীয় করিত সেইক্ষণে তাহার প্রতিকার ৺র কৃপাত যে হবে তাহা হৈত। অতএব পূর্ব্ব ৺র ধর্ম-কবুল পিতাপুত্র সম্বন্ধতে থাকিয়া আম্রা ৺র ধর্ম-ছারা কাম করি নাই। আপনেও ৺র ধর্ম্ম ছারা হৈলে ৺ধর্ম্মে রক্ষা করিবে না। অতএব যেরূপ পূর্ব্বপ্রীতি রক্ষা পায় আপনে তাহা করণে সে উচিত। ইতি, সন ১৭২৬, তারিখ ১৪ চৈত্র”।

(তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী,পৃঃ ১৬৫-৬৭)

এই চিঠি ক’খানার প্রসঙ্গে ‘তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী’র ভূমিকায় ডঃ সূর্যকুমার ভূঞা অতি মূল্যবান মন্তব্য রেখে গেছেন। তিনি বলেছেন,

“The preambles are in Sanskrit and consist of strings of epithets describing the addressor and the addressee which reveal the religion and creed they professed. The business portion of the letters is in Bengali, mutilated to a great extent by the influence of Assamese syntax and vocabulary. Any how they are good specimens of Benglai as it was used for court purposes outside Bengal; and in the absence of any extent Bengali prose writing of that period and even much later, these letters can be regarded as an extremely valuable acquisition to Bengali literature.”

অর্থাৎ “মুখবন্ধগুলি সংস্কৃতে রচিত এবং তাতে পত্রলেখক ও প্রাপক সম্পর্কে এমন সব বিশেষণমালা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিগুলির ব্যবসায়িক অংশ বাংলায় লেখা যদিও অসমীয়া বাক্যগঠন বিধি ও শব্দাবলীর প্রভাবে তা অনেকটাই বিকৃত। তবে বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে সরকারি ও আদালতের কাজকর্মে যে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতো এই চিঠিগুলি তার বিশিষ্ট নিদর্শন। তাছাড়া সেই সময়, এমন কি তার অনেক পরেও বাংলা গদ্য রচনার পর্যাপ্ত নিদর্শনের অনুভবে এই চিঠিগুলি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে।” ডঃ ভূঞার এই মন্তব্য থেকে এটা অতি পরিষ্কার যে ‘তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী’তে উদ্ধৃত কাছাড়ের রাজার চিঠি ক’খানার মূল ভাষা ছিল বাংলা। বুরঞ্জীতে সংযোজিত হবার সময়ে অসমীয়া লেখকের হাতে পড়ে শুধু অসমীয়া বাক্যগঠন বিধি ও শব্দাবলীর প্রভাবে বিকৃত হয়েছে।

উদ্ধৃত চিঠি পাঁচখানার একখানা লেখা হয়েছিল মহারাজ তাম্রধ্বজের রাজত্বকালে এবং বাকি চারখানা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে। তাম্রধ্বজের সময়ে মাইবাং ছিল ডিমাছা রাজাদের রাজধানী আর সমতল কাছাড়ের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে ছিল ধেয়ান রাজাদের খাসপুর রাজ্য। কিন্তু আহোম আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে মহারাজ কিছুদিনের জন্য বিক্রমপুরে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। উত্তর কাছাড় সংলগ্ন বিক্রমপুর-বড়খলাসহ বরাক নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল কাছাড়ের কিছু অংশ যখন মাইবাং রাজাদের অধিকারে ছিল। এই বাংলাভাষী অঞ্চলের শাসনকার্যের জন্য মহারাজ তাম্রধ্বজের সময়েই প্রথম বাংলা ভাষায় আইন তৈরি হয়েছিল। মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের সময়ে ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে বড়খলার চাঁদ লস্করের ছেলে মণিরাম লস্করকে এই

অঞ্চলের উজির নিযুক্ত করা হয়েছিল। ডিমাছা রাজত্বের শেষ অবধি মণিরামের বংশধরেরা ঐ অঞ্চলের শাসনকার্যে বিশেষ ভূমিকার উত্তরদায়ী ছিলেন। ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে খাসপুর রাজবংশের একমাত্র সন্তান রাজকুমারী কাঞ্চনীর বিয়ে হয় মাইবাং-এর রাজকুমার লক্ষীচন্দ্রের সঙ্গে। সেই সূত্রে দুই রাজ্যের সংযুক্তি ঘটে। কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা কমলনারায়ণ কর্তৃক খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত খাসপুরের ধেয়ান রাজবংশের ইতিহাসে যবনিকা নেমে আসে [১৩]। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাজপরিবার ও সভাসদ সহ খাসপুরে নেমে আসেন [১৪]। কৃষ্ণচন্দ্র রাজসিংহাসনে আসীন হবার প্রায় পঁচিশ বছর আগে খাসপুর ও মাইবাং রাজ্যের সংযুক্তি ঘটেছিল এবং ডিমাছা রাজাদের রাজধানী খাসপুরে স্থাপিত হয়েছিল। অর্থাৎ তাম্রধ্বজ ও কৃষ্ণচন্দ্র উভয়েই ছিলেন সমতল কাছাড়ের রাজা। বাংলাভাষী সমতল অঞ্চলে রাজকার্যে বাংলাভাষা ব্যবহারই ছিল স্বাভাবিক। আহোম শাসকেরা বরাক উপত্যকার এই ভাষিক কাঠামোকে যথাযথ বুঝতে পেরেছিলেন এবং অসমীয়া বুরঞ্জীর ইতিহাস-সচেতন লেখকেরাও চিঠি ক'খানা যতটুকু সম্ভব অপরিবর্তিতভাবে সংযোজনের চেষ্টা করেছেন। চিঠি ক'খানাতে বরাক উপত্যকায় চলিত শব্দসম্ভার ও প্রকাশভঙ্গির প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বুরঞ্জীর অসমীয়া লেখকের হাতে মূল বয়ান অনেকাংশে বিধ্বস্ত হলেও প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে কাছাড়ের জনবিন্যাস, ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই চিঠি ক'খানির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

আসাম ও কাছাড় উভয় রাজ্যেই মধ্যযুগের রাজপুরুষেরা উদার ও বাস্তবধর্মী ভাষানীতির পরিচয় দিয়েছিলেন। স্থানীয় ভাষাকে তারা রাজভাষার সম্মান দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ হেড়ম্বকান্ত বরপূজারীর মতে ''আহোম রাজসভায় যদিও অসমীয়াই চলে আসছিল, কূটনৈতিক সম্পর্কীয় লেখালেখিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা হচ্ছিল'' [১৫]। আসামের আহোম রাজারা অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে এই নীতি অপরিহার্য ছিল। প্রতিবেশী জয়ন্তীয়া ও ত্রিপুরা রাজ্যের মতো কাছাড়ের ডিমাছা রাজারাও শাসনকার্যে বাংলাভাষার ব্যবহার করে স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাসাধারণের মধ্যে লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই তিনটি রাজ্যেরই রাজস্ব সমৃদ্ধ ও জনবহুল সমতল অঞ্চল গাঙ্গেয় সমভূমির প্রাকৃতিক অংশবিশেষ। ভৌগোলিক কারণেই অতি প্রাচীনকালে ভারত-আর্য গোষ্ঠীর লোকেরা ইতিহাসের বিশ্বব্যাপী চিরন্তন ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিবেশী বঙ্গদেশ থেকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। পরিচিত পারিপার্শ্বিক ও কৃষিযোগ্য সমতল ভূমি তাদের উত্তর-পূর্ব মুখী চলমান গতিকে অব্যাহত রেখেছিল পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের তলা অবধি। তিন দিক থেকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা বরাক-সুরমা উপত্যকায় এসে এই গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রকৃতির নির্দেশে। কিন্তু কখন? সেই তত্ত্ব কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। হয়েছে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দী ও পরবর্তীকালে যখন আমরা ভারত-আর্য গোষ্ঠীভুক্ত বর্ণ ও ধর্মের মানুষকে এই উপত্যকার বাসিন্দা হিসেবে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন তাম্রশাসনে। এ সময়ে বা তারও আগে অন্য কোন জনগাষ্ঠীর বসতি বা রাজ্য গঠনের কোন তত্ত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু এখন পর্যন্ত উপলব্ধ সপ্তম শতাব্দীর সমতটের সামন্ত শাসক লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসনে সুবং বিষয়ায় শতাধিক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের উল্লেখই প্রাচীনতম বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক তথ্য। একই শতাব্দীর কলাপুর তাম্রশাসন দ্বিতীয় নিদর্শন। কিন্তু দশম শতাব্দীর পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'শ্রীহট্ট মণ্ডল' এই অঞ্চলের প্রাচীনতম স্থানীয় রাজনৈতিক কাঠামো। এই 'শ্রীহট্টমণ্ডল' এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর ভাটেরার দু'খানা তাম্রশাসনে উল্লিখিত সার্বভৌম 'শ্রীহট্ট রাজ্য' সমগ্র বরাক-সুরমা উপত্যকা নিয়ে ছড়িয়েছিল প্রাকৃতিক সীমানা অর্থাৎ পাহাড়ের তলা অবধি [১৬]। এই উপত্যকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত গড়ে গড়ে উঠেছিল একই সুবাদে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যুত্থান এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুরমা নদীর উত্তরাঞ্চল জয়ন্তীয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি বাংলা ভাষার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার পথ সুগম করেছিল। মধ্যযুগে করিমগঞ্জ সহ নিম্ন উপত্যকার তুর্কী ও মোগল শাসকেরা স্থানীয় শাসনকার্যে বাংলার ব্যবহার অব্যাহত রেখেছিলেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কাছাড়ে ডিমাছা রাজত্ব এখানকার বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক মহান অধ্যায়। রাজপরিবার ও সমতলবাসী বর্মণ সমাজ উপত্যকার মূল সাংস্কৃতিক স্রোতের হয়ে আঞ্চলিক ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করেছেন। রাজসভা সাহিত্যকৃতির কেন্দ্র হিসাবে ধন্য হয়েছে। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেছেন রাজ-আনুকূল্যে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র এবং বর্মণ কবি চন্দ্রমোহনের কাব্য প্রতিভা এখানকার জনমানসকে উদ্বেলিত করেছে। গ্রাম্যকবি কৃষ্ণমোহন শর্মার 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ও ' কালীচরণ উপাখ্যান' রচিত হয়েছে সেই যুগে। শাসনকার্যে বাংলার ব্যবহার এবং বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়ন প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। ◆

সূত্র নির্দেশ :

১) Kamalakanta Gupta,**Copper-plates of Sylhet,** Sylhet, 1967.

২) উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, **কাছাড়ের ইতিবৃত্ত,** ঢাকা, ১৯২১, পৃঃ৮৫-৮৮।

৩) ঐ পৃঃ ১১৩-১৪,১৬৩-৬৫।

৪) ঐ পৃ-ঃ ১২৪-২৫।

৫) ঐ পৃঃ ৭৬-৭৭।

৬) অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, **শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত,** কলিকাতা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১০২-১০৪।

৭) **হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি,** গৌহাটি, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

৮) **কাছাড়ের ইতিবৃত্ত,** পৃঃ ১৮১।

৯) ঐ পৃঃ ১৭৪।

১০) ঐ পৃঃ ১৭৬-৭৭।

১১) ঐ পৃঃ ১৯১-৯২।

১২) ঐ পৃঃ ১৭৮-৮১

১৩) খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ, **কোচবিহারের ইতিহাস,** কোচবিহার, রাজশক ৪২৬।

১৪) C.A. Soppit, **A Historical andDescriptive Account of the Kachari Tribes in the North Cachar Hills**, Shillong, 1885, P -5.

১৫) অসমর নব-জাগরণ ঃ অনা-অসমীয়ার ভূমিকা, অসম সাহিত্য সভা, যোরহাট, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৯।

১৬) B.Bhattacharjee, **Social and Political Formations in Pre-colonial North East India :The Barak Valley Experience**, New Delhi, 1990, pp.18-38.

আসামের ভাষা সমস্যা ঃ উৎস এবং পটভূমি

সুজিৎ চৌধুরী

ভাষিক বিচারে আসামের চরিত্র বহুভাষিক হলেও এই ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করে রাজ্যকে একভাষী প্রদেশ হিসেবে তুলে ধরার প্রণালীবদ্ধ প্রয়াস চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এতে রয়েছে রাজশক্তির প্রশ্রয় ও সহায়তা। লেখক বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, অসমিয়া জাতি বিকাশ পূর্ণতা না পাওয়ায়ই জটিলতা বেড়েছে। এরই সূত্র ধরে শ্রীহট্টকে পাকিস্তানের হাতে সঁপে দেওয়া, গোয়ালপাড়ায় বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি ঘটানো এবং বরাকের ভাষিক পরিচিতি নিয়ে নানা কৌশলে প্রশ্ন তোলার পরিকল্পিত চেষ্টা চলে আসছে।

গত তিন দশকে আসাম সমস্যা নিয়ে অন্তত কয়েক কোটি শব্দ মুদ্রাযন্ত্রে পিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে চটজলদি সংবাদ-ভাষ্যের সংখ্যাই সমধিক, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে কিছু সিরিয়াস আলোচনাও বেরিয়েছে। সেগুলোতে আসাম সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে যে দুটো তথ্য বারবারই যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উত্থাপিত, তা হল —এক, অসমিয়া জাতির অগ্রণী অংশটি নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে সত্যিই ভাবিত এবং দুই, এই ভাবনার বাস্তব ভিত্তি নিহিত রয়েছে অসমিয়া জাতিসত্তার অসম্পূর্ণ বিকাশের মধ্যে। একই সূত্রে গ্রথিত এ দুটো তথ্য সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই— নিশ্চিতই আসাম আন্দোলনের উত্তাপ এবং বিস্তৃতির সঙ্গে অসমিয়া জাতিসত্তার অসম্পূর্ণ বিকাশের ব্যাপারটি কার্য- কারণ সূত্রে আবদ্ধ।

জাতিসত্তার বিকাশ একটি ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল। এবং সমাজবিজ্ঞানীরা সে প্রক্রিয়ার পর্যায়গুলোকে মোটামুটি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে সক্ষম। সে বিচারে অসমিয়া জাতির গঠন-প্রক্রিয়া নিশ্চিতই এখন পর্যন্ত অসমাপ্ত—বস্তুত সে পরিক্রমণ পথের মধ্যস্থলেই তার বর্তমান অবস্থান। তদুপরি আসু'র আন্দোলন সে পরিক্রমণের গতিপথকেই শুধু অবরুদ্ধ করে দেয়নি, অর্ধগঠিত অসমিয়া জাতিসত্তার মধ্যে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত নবাগতরা আজ নিজ নিজ গোষ্ঠীসত্তাকেবিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার কথাও ভাবছেন।

বোড়ো, কাছাড়ি এবং তাদের সহযোগী অন্য জনজাতীয়রা পূর্ববঙ্গাগত চাষি মুসলমান এবং হিন্দু উদ্বাস্তুর গ্রামীণ অংশ, চা বাগানের শ্রমিক এবং তাদের অশ্রমিক বংশধর— কেউবা স্বাভাবিক নিয়মে, কেউবা অনন্যোপায় হয়ে অসমিয়া জাতিসত্তার শরিক হয়েছিলেন এবং এদের নিয়েই আসাম রাজ্যে অসমিয়াভাষীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ। এই আগন্তুক শরিকদের অনেকেই আজকে থমকে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের ধারণা আসাম আন্দোলনের অন্তর্লীন ভাবধারাটি তাঁদের সদিচ্ছার অবমাননা করেছে। অর্থাৎ আন্দোলনের সূত্রপাতের সময়ে অসমিয়া জাতি-গঠন প্রক্রিয়া যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল আজ থেকে কিছুটা পিছিয়ে গেছে এবং সেই বিচারে অসমিয়া জাতির অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত আসাম আন্দোলন আজ যথার্থই counter productive হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের বিবেচনায় অসমিয়া জাতিসত্তা ভ্রূণাবস্থা থেকেই একটা মৌলিক দুর্বলতায় ভুগছে এবং ঐতিহাসিক বিচারে সে দুর্বলতার স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব। অবশ্য তার জন্যে অন্তত ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ইতিহাসের পাতা উল্টে যাওয়া একান্তই আবশ্যিক। দুর্ভাগ্যত সে কাজটিতে কেউ হাত দেননি, আসাম সমস্যার হেতুবিচারে ১৮২৬ সালের ওদিকে কাউকে দৃক্‌পাত করতে বড় একটা দেখিনি। ১৮২৬ সালে ইয়াণ্ডাবোর সন্ধির মাধ্যমে আসামে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল সে তো নিশ্চিতই একটা বড় ঘটনা, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তো সত্যি আসামের তার আগেরও একটা ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাসের উত্তরাধিকার রাজ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আজও বহন করছেন।

গুপ্ত রাজাদের আমলেই কামরূপ রাজ্যের সম্মানজনক অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা তাম্রলিপি থেকেই পাচ্ছি। কিন্তু সে রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল পশ্চিম কামরূপ এবং তার স্বাভাবিক সম্প্রসারণ লক্ষ্য ছিল উত্তর পশ্চিমবঙ্গ বা বরেন্দ্র -পুণ্ড্রবর্ধন এবং পূর্ববঙ্গ বা বঙ্গ-সমতট। কামরূপের তিনটি আর্যভাবাপন্ন রাজবংশ—বর্মণ, শালস্তম্ভ এবং পালবংশ—যারা ধারাবাহিকভাবে প্রায় আটশ বৎসর এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন, তারা আর্যীকৃত বরেন্দ্র—বঙ্গ সমতটের উপর আধিপত্য বিস্তারেই সমধিক আগ্রহী ছিলেন— ভাস্করবর্মণ-শশাঙ্কের সংঘাতের ব্যাপারটাও সেই প্রয়াসেরই অঙ্গ ছিল। তাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং হয়তো বা আনুগত্যও ছিল আরেকটু পশ্চিম ঘেঁষা, তারা নালন্দায় দান করতেন এবং বারাণসীতে ছাত্র পাঠাতেন। অপরদিকে নিজ রাজ্যের পূর্বাংশে বসবাসকারী জনজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ছিল সীমাবদ্ধ। লিপিপ্রমাণগুলো থেকে এমন কোনো তথ্য আমরা পাইনি যাতে মনে করা যেতে পারে যে আজকের পূর্ব—আসামের সে সময়কার বাসিন্দাদের সঙ্গে কামরূপীয় রাজাদের কোনো যোগাযোগ ছিল। এমনকি নিজ রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে বসবাসকারী বোড়োজাতীয় উপজাতিরা ছিলেন রাষ্ট্রীয় করুণাধারা থেকে বঞ্চিত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ পণ্ডিতজনেরা অনুমান করেন যে উল্লিখিত তিনটি রাজবংশের অন্তত দুটির উদ্ভব ঘটেছিল ঐ ধরনের জনজাতীয় সমাজ থেকেই। এদের আমলের যে সমস্ত তাম্রলিপি এবং অন্যান্য স্মারক আমাদের হাতে এসেছে, তাতে একটা কথা স্পষ্ট যে খ্রিস্টিয় একাদশ শতক পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যে পশ্চিমদেশাগত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণরাই ছিলেন রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে পরিপুষ্ট, রাজ্যের স্থানীয় অধিবাসী, জনজাতীয়রা নন। ফলে শেষোক্তরা থেকে গেলেন ট্রাইবেল সামাজিক-অর্থনীতিক কন্দরে, সামন্ততান্ত্রিক কৃষি- অর্থনীতিতে উত্তরণও তাঁদের ভাগ্যে ঘটল না। অসমীয়া জাতিসত্তার জন্মলগ্নেই তাই একটা ফাঁক থেকে গেল। প্রতিবেশী রাঢ়, বঙ্গ, সমতটের সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করলেই এই ব্যর্থতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। পাল পর্বের আগেই সেখানে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, গোটা পালযুগ ধরে চলেছে ব্যাপক সমন্বয়, তাই সেনযুগের সূচনায় আধুনিক বাঙালি জাতির আদি অবয়বটি

সুপরিস্ফুট।

সকলেই জানেন যে ঠিক ঐ সময়েই পূর্বমাগধী থেকে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠার লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের পরিহাস হচ্ছে এই যে বাংলা ভাষার ঐ আদিম রূপটির সঙ্গে সমকালীন কামরূপীয় ভাষার তেমন কোনো তফাৎ ছিল না। অসমিয়া ভাষার আদিম রূপটিও চর্যাপদেই বিধৃত আছে। এমনকি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো কোনো বিশিষ্ট প্রয়োগের মধ্যেমে অসমিয়া বাক্রীতির সাদৃশ্য অসমিয়া ভাষাবিদরা লক্ষ্য করেছেন। অর্থাৎ ইতিহাস যদি সহায় থাকত, তবে বাংলা এবং অসমিয়া ভাষার মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নাও ঘটতে পারত, অন্তত সে বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল না। তখন হয়তো অন্যতর কোনো নামে দুটো ভাষার সমন্বিত রূপই বিস্তৃত এই পূর্বাঞ্চলে বিরাজ করত। কিন্তু ইতিহাস বাধ সাধল, তুর্কি আক্রমণ আজকের বঙ্গভাষী অঞ্চলেই সফল হল, তাদের একাধিক কামরূপ অভিযান হল প্রতিহত। পরবর্তী পাঠান-মোগল যুগেও কামরূপ পশ্চিমাগত বহিঃশত্রুর কাছে মাথা নোয়ালো না এবং একই সময়ে পূর্বদিকের দরজা খুলে তাই জাতীয় আহোমরা আসামে ঢুকে বেশ জাঁকিয়ে বসে পড়েল। মোগলরাজ্য এবং আহোমরাজ্যের সীমারেখাটি তাই শেষপর্যন্ত একটা ভাষাগত সীমারেখাও দাঁড়িয়ে গেল।

আহোম বিজয়ের পর পরিস্থিতির যে পরিবর্তনটা ঘটল, তাকে গুণগত বলা যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত আসামের রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রভূমি ছিল পশ্চিম আসাম, রাষ্ট্র-পরিচালকরা ছিলেন আর্যধর্মাশ্রিত। এবারকার রাষ্ট্রশক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করল পূর্ব-আসামে এবং তার ধর্ম-সংস্কৃতি সবই মঙ্গোলীয় অর্থাৎ অনার্য। কিন্তু তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রাক্ -আহোম রাজশক্তি পশ্চিম আসামে সামন্ততন্ত্রকে পুরো প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, কিন্তু সে পথে স্থির -নিশ্চিত যাত্রা শুরু করেছিল। সে তুলনায় আহোম রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল একান্তই উপজাতীয়, এমনকি দীর্ঘ সাতশত বৎসরের রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতাও তাঁদের রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে পরিপূর্ণ সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি। কিন্তু তাঁদের সরল এবং বলিষ্ঠ উপজাতীয় সংগঠন প্রতিবেশী অন্যান্য স্থানীয় উপজাতিকে আকৃষ্ট করেছিল এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে না হলেও সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন উপজাতীয়রা মিলে আহোম রাষ্ট্রকে একধরনের আভ্যন্তরীণ শক্তি জুগিয়েছিল।

কিন্তু আহোমদের এই নূতন রাষ্ট্রীয় সামাজিক আধা-উপজাতীয় দর্শন পশ্চিম আসামের আর্যপ্রভাবিত সমাজের উচ্চকোটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, পারার কথাও নয়। সেখানে, আরেকটু পশ্চিমে সরে গিয়ে, কোচবিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নূতন রাষ্ট্রশক্তি, কোচ বংশোদ্ভব রাজা নরনারায়ণের প্রচেষ্টায়। নরনারায়ণের দূরদৃষ্টি ছিল, তদুপরি তিনি কাশীতে দীর্ঘদিন বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন, অতএব উত্তর ভারতের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল। পশ্চিম আসামে স্থানীয় যে সমস্ত উপজাতীয় গোষ্ঠীকে পূর্ববর্তী কামরূপীয় রাজশক্তি মূল সমাজ কাঠামোর মধ্যে আনতে পারেনি, তিনি চাইলেন সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সে কাজটা সম্পূর্ণ করতে — পুরোদস্তুর সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলার এটাই ছিল পূর্ব শর্ত।

মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে আহোমরা বিতাড়িত করেছিল, আর নরনারায়ণ তাঁকে কোচবিহার রাজসভায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। নরনারায়ণের এই পৃষ্ঠপোষকতা এবং আহোমদের এই বিরোধিতা, দুটোর কোনোটাই কাকতালীয় নয়, সমসাময়িক আসাম–কোচবিহারের সামাজিক- রাজনৈতিক প্রক্ষিতে এমনটা ঘটাই ছিল অনিবার্য। আদিবাসী সমাজের মানুষকে বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে একটি সংহত সমাজ কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল এবং মহারাজ নরনারায়ণের রাষ্ট্রীয় চিন্তার বাস্তবায়নের ব্যাপারে এই ধরনের প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা ছিল প্রশ্নাতীত। নরনারায়ণের সঙ্গে শঙ্করদেবের সমঝোতার

ব্যাপারটা যে একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনারই অংশ ছিল, অন্ততঃ নরনারায়ণের দিক থেকে, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে রাজা নিজে কিন্তু শঙ্করীয় মহাপুরুষীয়া ধর্মে দীক্ষিত হননি, কুলগত শাক্তধর্মে তিনি এবং তার বংশধরেরা অবিচলিত ছিলেন। শঙ্করদেব পেয়েছিলেন নরনারায়ণের আশ্রয় ও সহযোগিতা এবং কোচবিহার সহ পশ্চিম কামরূপে সামাজিক সমন্বয় সৃষ্টির ব্যাপারে শঙ্করদেব একটা বেগবান আন্দোলন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন। জনজাতীয় সমাজের যে সমস্ত মানুষ সে সময়ে বা তার পরবর্তীকালে মহাপুরুষীয়া ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করার পর তাঁরা আজ পুরোপুরি অসমিয়া সমাজের অংশ। অসমিয়া জাতিসত্তা গঠনে শঙ্করদেবের এই পথিকৃতের ভূমিকা আজও যথার্থ মর্যাদায় বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। দুর্ভাগ্যত নরনারায়ণের পরবর্তী সময়ে কোচরাজ্য খণ্ড–বিখণ্ড হয়ে যায় এবং চিলারায়ের যে বংশধররা পশ্চিম আসামে তাঁর উত্তরাধিকার বহন করলেন, তারা বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্তভাবে কখনও কখনও শঙ্করের শিষ্য-প্রশিষ্যদের সহায়তা করলেও রাষ্ট্রচিন্তা এবং সমাজচিন্তাকে একই খাতে বইয়ে দেওয়ার মতো ধী-শক্তি তাঁদের ছিল না। অতএব শঙ্করদেবের নেতৃত্বে এবং নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক আত্মীকরণের যে আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে তার গতিবেগ স্তিমিত হয়ে যায়। বোড়ো এবং সমজাতীয় গোষ্ঠীগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি আর কামরূপীয় অসমিয়া প্রবাহের সঙ্গে মিশে যেতে পারল না, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তারা টিকে রইল নিজেদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদর্শকে অবলম্বন করে, লাঙ্গল ভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতি পশ্চিম আসমেও গড়ে উঠল না, কারণ যে ব্রাহ্মণ্য সামন্ততন্ত্র দেশের সর্বত্র উপজাতীয় শ্রেণীর লোকদের ধর্মের বন্ধনে টেনে এনেই ভূমিশ্রমিকের অভাবটা পূরণ করেছে এখানে সে কাজটা শুরু হয়েও শেষ হয়নি। এতে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভূমি-শ্রমিক যোগানের যে পার্থক্য সূচিত হল, ব্রিটিশযুগে তার সুযোগ নিয়েই পূর্ব-বঙ্গাগত মুসলমানরা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নিজেদের বসতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। জনজাতীয়দের সঙ্গে পশ্চিম আসামের সংগঠিত হিন্দু সমাজের আর্থ-সামাজিক এই বিভাজন সেই ঐতিহাসিক আমলেই কোনো কোনো সময়ে রাজনৈতিক তাৎপর্যও লাভ করত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে মোগল আক্রমণের সময়ে বর্ণহিন্দু ভূস্বামী জমিদাররা অনেক সময়েই বহিরাগত শত্রুদের সহায়তা করেছেন, কিন্তু জনজাতীয়রা দাঁড়িয়েছেন আহোম রাষ্ট্রশক্তির পেছনে।

পূর্ব আসামে আহোমরা যে নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুললেন তার আর্থ -সামাজিক গঠনটা ছিল অর্ধ-উপজাতীয়। ডঃ অমলেন্দু গুহ ব্যাপারটা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব আসামে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার যে দ্বীপগুলো ভূস্বামীদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল, রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্যায়েই আহোমরা সেগুলোর উপর আঘাত হেনেছিলেন। যেহেতু সামন্ততান্ত্রিক স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার কোনো আগ্রহ তাদের ছিল না, আহোম রাজশক্তির কাছে শঙ্করদেব ছিলেন অপ্রয়োজনীয় এবং শ্রেণী পরিচয়ে শঙ্করদেব যে ভূস্বামীকুলের সন্তান,তারা ছিলেন আহোমদের প্রতিপক্ষ। অতএব শঙ্করদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম আহোমদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি, পেয়েছিল প্রতিরোধ ও উৎপীড়ন। প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল শঙ্করদেবের জামাতাকে এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন মাধবদেব সহ ক'জন প্রথম সারির শঙ্কর-শিষ্য। শঙ্করদেবের সঙ্গে আহোম রাজবংশের এই যে সংঘাত, এর জের কিন্তু একদিনে মেটেনি, তিনশ বছর পর এর চূড়ান্তরূপ আমরা পাই মোয়ামারিয়া বৈষ্ণবদের বিদ্রোহে, যা থেকে আহোম রাজত্বের ধ্বংসের সূত্রপাত। ধর্মের আবরণে সংঘটিত এই বিদ্রোহের কারণ ছিল আর্থ-সামাজিক, উত্তরপূর্ব আসামে মোয়ামারিয়া ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পথিকৃৎ এবং শঙ্করদেবের ধর্ম থেকে তারা পেয়েছিলেন উচ্চতর সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার রসদ। দুটি বিপরীতমুখী ধারার মধ্যেকার এই

সংঘাত ছিল ঐতিহাসিক বিচারেই অনিবার্য।

অর্ধ- উপজাতীয় সামাজিক সংগঠন নিয়ে একটি রাষ্ট্র কিভাবে তার অপরিণত অর্থনৈতিক বিকাশকে সম্বল করে সাতশত বৎসর টিকে রইল, সেটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। আমাদের শুধু এইটুকু মনে রাখলেই চলবে যে উত্তরপূর্ব ভারতে এটা ছিল একটা সাধারণ লক্ষণ— জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা, কাছাড় তারই নিদর্শন, ভারতের বাইরে ভূটান, তিব্বতও রয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে এও সত্যি যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবেই তার সহযোগী উপাদানগুলোর চাহিদা তৈরি করে, তাই আহোম রাজশক্তি ও পরবর্তীকালে সামন্তবাদী সংগঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। তারই পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য তারাও ধর্মকে ব্যবহার করার কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বৈরিতাটা ততদিনে এতখানিই মজ্জাগত হয়ে গেছে যে আহোমরা তখন ধর্মগুরু হিসাবে বাইরে থেকে শাক্ত ব্রাহ্মণদের আমদানি করতে শুরু করলেন। কিন্তু যেহেতু আসামের বিশিষ্ট প্রয়োজনগুলো সম্পর্কে এই সমস্ত শাক্তগুরুদের কোনো ধারণা ছিল না, অতএব আরোপিত এই ধর্ম উন্মাদনা সমাজদেহে নূতন কতকগুলো জটিলতারই সৃষ্টি করল মাত্র। শঙ্কর-শিষ্য দামোদরদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর অনুগামীদের বলা হত দামোদরীয়া, এরা শঙ্করীয়া ধর্মের সাম্যমূলক পথ থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন। এদের সঙ্গে আঁতাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য -অভিমান প্রসূত দামোদরীয়া পন্থাও মূল মহাপুরুষীয়া ধর্মের বিকল্প হতে পারেনি, রাজশক্তির সাময়িক পৃষ্ঠ পোষকতা সত্ত্বেও। তাই আহোম রাষ্ট্রসংগঠনের পূর্ণ সামন্তবাদে উত্তরণের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আর ঘটল না। এবং সেই সঙ্গে আসামের জাতিসত্তার বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়টাও অসমাপ্ত থেকে গেল, আহোম রাজশক্তি সামাজিক আত্মীকরণের বাহিকা শক্তি হিসাবে স্বীয় ইতিহাস- নির্দিষ্ট ভূমিকাটি পালন করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুণ।

একথা স্পষ্ট যে ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তা গঠনের যে পর্যায়টা সামন্তযুগেই উত্তীর্ণ হওয়ার কথা, অসমিয়া জাতির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। এ পর্যায়ে অবশ্য একটি গুরুত্বপর্ণ এবং স্বস্তিকর ঘটনা ঘটেছিল। আহোমরা তাদের আদিম ভাষা (তাই -আহোম) বর্জন করে অসমিয়া ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে দুটো সুফল পাওয়া গেল। মঙ্গোলীয় ইতিহাস চেতনার উত্তরাধিকারী হিসাবে আহোম রাজারা স্বস্ব কালের ইতিহাস (বুরঞ্জী) লিখতেন, এতদিন তা লিখা হত 'তাই' ভাষায়, এবার তা স্থানীয় ভাষায় লিখা শুরু হল। ফলে অসমিয়া গদ্য একটা পরিণত রূপ পেয়ে গেল, বাংলা গদ্য হাঁটি হাঁটি পা পা শুরু করার অনেক আগেই। দ্বিতীয়ত, এতদিন পর্যন্ত পশ্চিম আসামে প্রচলিত 'কামরূপী' ভাষাই ছিল শিষ্ট ভাষা, তার সঙ্গে পূর্বোত্তর বঙ্গের কথ্যভাষার তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না, যে কারণে ভাষাতত্ত্ববিদরা পূর্বোত্তর বঙ্গের কথ্যভাষাকে আজও 'পশ্চিম কামরূপী' বলে অভিহিত করেন। এই 'পশ্চিম কামরূপী' উপভাষাকে কিন্তু বাংলা ভাষা আত্মস্ত করে নিয়েছে। 'পূর্ব কামরূপী'র ক্ষেত্রেও তা ঘটত কিনা, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না, কিন্তু আহোমরা এই ভাষাকে গ্রহণ করে তার মধ্যে পর্যাপ্ত মঙ্গোলীয় শব্দ এবং বাক্‌ভঙ্গি ঢুকিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে এই রাজভাষার শিল্পরূপটির নূতন কেন্দ্রভূমি হয়ে দাঁড়াল আহোম অধ্যুষিত শিবসাগর জেলা। পূর্বমাগধী অপভ্রংশের একেবারে পূর্বপ্রান্তিক রূপটি যে আহোম সংস্পর্শে এসেই নিজ বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে আজকের অসমিয়া ভাষায় পরিণত হয়েছে, সেকথা স্বীকার করে নিতে ঐতিহাসিক বিচারে কোনো আপত্তি হওয়ার কারণ নেই। এতসব সত্ত্বেও ক্ষত কিন্তু কিছু থেকেই গেল। আহোম রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী রয়ে গেল, যারা অসমিয়া সমাজের কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়ক শক্তি হিসাবে এগিয়ে এল না, কারণ আহোম রাজত্বের অর্ধ-উপজাতীয় চরিত্র আত্মীকরণের উপযোগী আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি গড়ে তুলতে পারেনি।

তাই ব্রিটিশ শাসনে আসাম যখন সরাসরি বিদেশি পুঁজি, আধুনিক রাষ্ট্রগঠন এবং এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনিবার্য সমস্ত দেশি-বিদেশি প্রভাবের সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল, অসমিয়া জাতি তখন আত্মবিশ্বাসের অভাবে দোলায়মান এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই পর্বেই ধারাবাহিকভাবে এমন কিছু ঘটল, যা অসমিয়া জাতির অর্ধবিকশিত সত্তাকে আরো জটিলতার মধ্যে ফেলে দিল।

এই জটিলতার স্বরূপ বুঝতে হলে ১৮৭৪ সালে তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসাম নাম দিয়ে যে নতুন একটি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ গড়া হল, তার স্বরূপটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। মূলত চারটি স্বতন্ত্র অংশ নিয়ে এই নুতন প্রদেশের জন্ম, যার মধ্যে ছিল (১) আহোমদের রাজ্য, যা ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সীমায়িত এবং যাকে পাঁচটি জেলায় ভাগ করা হয়েছিল, যথা কামরূপ, দরং, শিবসাগর, লখিমপুর ও নগাঁও। নগাঁও জেলার দক্ষিণাংশ অবশ্য আহোম রাজ্যের অংশ ছিল না। এই অংশ ছিল ডিমাসাদের অধীন। বস্তুত যমুনা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী মহং ছিল আহোম রাজ্যের সীমা এবং নদীর পূর্ব তীরবর্তী দিজুয়া ছিল ডিমাসা রাজ্যের সীমা। নগাঁও জেলার একটা বড় অংশ যে ডিমাসা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এ সত্য আজ সবাই প্রায় সুবিধাজনকভাবে বিস্মৃত। (২) গোয়ালপাড়া জেলা, যা ছিল মোগল আমলের বাংলা সুবার অংশ এবং ইংরেজরা দেওয়ানি লাভের সূত্রে এই জেলার উপর আধিপত্য বিস্তার করে ১৭৬৫ সালে আহোম রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে যাওয়ার ৬১ বৎসর আগে। (৩) গারোপাহাড়, খাসিজয়ন্তীয়া পাহাড়, উত্তর কাছাড়, মিকিরপাহাড়, নাগাপাহাড় সহ পার্বত্য অঞ্চল সমূহ। যার সঙ্গে পরবর্তীকালে বিহিত অন্য পার্বত্য অঞ্চল সমূহও যুক্ত হয়, (৪) শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সমভূমি যার তৎকালীন অভিধা ছিল সুরমা উপত্যকা। ভাষিক বিচারে প্রথম অংশটি ছিল মুখ্যত অসমিয়াভাষী, যদিও এর অভ্যন্তরেও বিস্তৃত জনজাতীয় অঞ্চল ছিল, যারা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে তখন ছিলেন, এখনও রয়েছেন। দ্বিতীয় অংশের অধিবাসীরা ছিলেন বঙ্গভাষী। যদিও পূর্বাংশের কথ্যভাষা বাংলা ও অসমিয়া এই উভয় ভাষারই লক্ষণাক্রান্ত ছিল, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের যা সাধারণ লক্ষণ। তৃতীয় অংশে ছিল পার্বত্য উপজাতীয় গোষ্ঠী সমূহের বাস যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বর্তমান। চতুর্থাংশের ভাষা বাংলা এবং এই অঞ্চলের ভাষিক সংখ্যালঘুদের মধ্যে রইলেন মণিপুরি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, ডিমাসা এবং চা-শ্রমিক বিভিন্ন ভাষিকগোষ্ঠী যাদের মধ্যে হিন্দিভাষীর সংখ্যাধিক্য রয়েছে।

ফলে প্রদেশের নাম যদিও দেওয়া হল আসাম, কিন্তু ভাষিক বিচারে প্রদেশটি দাঁড়াল বহুভাষিক। রাজনৈতিক ইতিহাস, ভৌগোলিক পটভূমি, সাংস্কৃতিক পটভূমি সমস্ত বিচারেই অঞ্চলগুলির মধ্যে রইল বিভিন্নতা।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কথাটি যত সহজে উচ্চারণ করা যায়, তত সহজে কার্যকর করা যায় না। আসাম প্রদেশের এই বৈচিত্র্যময় ভাষিক চরিত্র তার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেনি, বস্তুত ব্রিটিশ রাজশক্তির উদ্দেশ্যও তা ছিল না। একদিকে অসমিয়া জাতিসত্তা তার জন্মলগ্নের মৌলিক দুর্বলতা নিয়ে নিজের আত্মরক্ষার ক্ষমতা সম্পর্কে খুব একটা নিঃসংশয় ছিলনা। মানসিক এই ভয়কে আরেকটু বাড়িয়ে দিল রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি। বিস্তৃত আবাদযোগ্য পতিতভূমি টেনে নিয়ে এল প্রতিবেশী পূর্ববঙ্গের ভূমিহীন কৃষকদের। পর্বত সানুদেশের টিলাভূমিগুলো পরিণত হল চা-বাগানে, সেখানকার শ্রমিকবাহিনীও সংগ্রহকৃত হল বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ বা উপজাতীয়দের মধ্য থেকে। আর প্রশাসিনক ক্ষেত্রে মাঝারি বা নিম্নতর পর্যায়ের আসনগুলোর অধিকাংশই প্রথমদিকে অধিকৃত হল বঙ্গভাষীদের দ্বারা, কারণ ইংরেজি ভাষার দ্বার তাদের কাছে আগেই উন্মোচিত হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাসের নেতিবাচক উত্তরাধিকার এবং পরবর্তী ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিকূল প্রশাসনিক পরিকল্পনা, এ দুটো অসমিয়া জাতিসত্তাকে বিভ্রমের মধ্যে ফেলে দিল।

এই বিভ্রমের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্যায়ে অসমিয়া বুদ্ধিজীবীরা দুটো অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। গুণাভিরাম বরুয়া বা বলিনারায়ণ ডেকা জাতীয় উদারপন্থীরা চাইতেন যে দেওয়া–নেওয়ার মাধ্যমে অসমিয়া বাঙালির মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠুক। কিন্তু আরেক দল সংঘাত ও দ্বন্দ্বের মধ্যেই অসমিয়া জাতিসত্তার বিকাশ সম্ভব বলে মনে করতেন। দুর্ভাগ্যত ধীরে ধীরে ব্রিটিশ রাজশক্তির সক্রিয় প্রশ্রয়ে দ্বিতীয় দলটিই প্রবল হয়ে ওঠে। আজও অসমিয়া সমাজে দুটি ধারাই বহমান, কিন্তু সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ যে সমস্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হত, তার বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ, মূলত তা এসে সংহত হত ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার মধ্যেকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে। গোয়ালপাড়া জেলায় অবশ্য লোকগণনা এবং নির্বাচনের সময়েও সংকীর্ণতার উত্তাপের তীব্র প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ১৯১১ সালের লোকগণনার সময় থেকেই। প্রাক্ স্বাধীনতার যুগের সেই ক্লান্তিকর অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে শ্রীহট্ট পাকিস্তানের হাতে সঁপে দেওয়ার মাধ্যমে আসামের সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতি একটি বড়রকমের সাফল্য অর্জন করে।

জনবহুল শ্রীহট্ট জেলাকে আসাম থেকে বিযুক্ত করার পরই এই প্রদেশকে বলপ্রয়োগে একভাষিক রাজ্যে পরিণত করার ব্যাপক প্রয়াস শুরু হয়। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কোন বিশিষ্ট অসমিয়া বুদ্ধিজীবী কাছাড়কেও , বিশেষ করে হাইলাকান্দি মহকুমাকে পাকিস্তানে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে মুখ্যত দুটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে আসামকে একভাষী রাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। একটি প্রক্রিয়া ছিল স্থূল বলপ্রয়োগের, দ্বিতীয় প্রক্রিয়া সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশের। স্থূল প্রক্রিয়াটি আসামের পার্বত্য জেলাসমূহে প্রয়োগ করতে গিয়েই নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্যের জন্ম হয়। বঙ্গভাষীদের ক্ষেত্রে এই স্থূল বলপ্রয়োগের আলোচনায় আমরা পরে আসছি, তার আগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যেকার জনজাতীয়দের ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম কার্যক্রম গ্রহণ করা হল, তার সামান্য বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

আসামের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা করেছেন অধ্যাপক ডঃ সুশান্তকৃষ্ণ দাস। আলোচনাটি প্রথমে বের হয় The Economic and Political Weekly পত্রিকায়। পরে ঐ আলোচনাটিই আরেকটি বিস্তৃত আকারে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯৩১ সালে আসামে বোড়োভাষীদের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার, সেখানে ১৯৫১ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কমে গিয়ে চার লক্ষ আঠারো হাজার। দশ বৎসরে যদি বোড়োদের সংখ্যা শতকরা দশভাগও বেড়ে থাকে, তবে এই সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল পাঁচ লক্ষ দশ হাজার। ১৯৩১ সালে মিশিং (মিরি)দের সংখ্যা ছিল একাত্তর হাজার, ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াল তিপান্ন হাজারে। কার্বিদের সংখ্যা ছিল একলক্ষ এগারো হাজার, তারা দাঁড়ালেন এক লক্ষ বিশ হাজারে, যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হারের চাইতে কম। সব মিলিয়ে দেখা গেল জনজাতীয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলির বৃদ্ধির হার বিশ বৎসরে দ্রুত নিম্নগামী হয়ে যাচ্ছে। এমনটি হল কেন? সেন্সাস কমিশনার ভাগাইওয়ালা এর কারণ নির্ণয় করেছেন, "with the solitary exception of Assamese, every single language or Language group in Assam shows a decline in the percentage of people speaking the same. All these decline have gone to swell the percentage of people speaking the Assamese in 1951." তার সঙ্গে সেন্সাস কমিশনারের মন্তব্য রয়েছে "The figures do not fail to reflect thje aggressive nationalism now prevailing in Aassm" ইত্যাদি। aggressive nationlism- ই আজ সবধরনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বলেই জনজাতীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আজ এত বিক্ষোভ, এত উত্তেজনা। কার্বি ছাত্র সংস্থা এবং

কার্বিআংলং স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য দাবি সমিতি (ASDC) এই মনোভাবটি সম্প্রতি তাদের স্মারকলিপিতে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন 'The suppressive language policy of the sucessive Governments of Assam is another domination the hillmen have been subjected to time and again.... The new generation of the Assamese politicians have also upheld the policy of Assamisation and the AGP Government just after ascending to power had made a similar attempt and the non-Assamese had to make hue and cry again. The hillmen are, therefore, convinced that their unique language and their tradition as tribals have no prospect whatsoever in Assam.' মোটামুটি একই মনোভাব বোড়ো, রাভা, মিশিং, লালুং, ডিমাসা প্রভৃতি সকল জনজাতীয় গোষ্ঠীই ব্যক্ত করেছেন।

আসামে বঙ্গভাষীরা স্বাধীনতার পর থেকেই এক বিশেষ ধরনের আক্রমণের শিকার হন। রাষ্ট্রশক্তিই এই আক্রমণের উদ্যোগ নেন। ১৯৪৭ সালের ৫ই নভেম্বর স্বাধীনতার পরবর্তী আসামের বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে এবং তাতে রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে গোপীনাথ বরদলই মন্ত্রিসভার মনোবাসনাটি এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয় : "The natives of Assam are now the masters of their own house. They can take what steps are necessary for the propagation of Assmaese language and culture... The Bengalee has no longer the power, even if he had the will, to impose anything on the pople of those hills and valleys whcih constitute Assam. The basis of such felllings against him as exist is fear–but now there is no cause for fear. I would, therefore appeal to you to exert all the influence you possess to give the stranger in our midst a fair deal, provided of course he in his turn deals loyally with us." লক্ষণীয়, এখানে প্রথমেই বঙ্গভাষীদের সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাকে stranger (আগন্তুক) বলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে একথা বেশ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে নয়, শুধুমাত্র নিঃশর্ত আনুগত্যের ভিত্তিতেই তারা আসামে বসবাস করতে পারবে।

অতএব 'propagation of Assamese language and culture' এবং আগন্তুকদের 'loyalty' শেখাবার কাজটা শুরু হল। প্রথম লক্ষ্য হল গোয়ালপাড়া জেলা। সেখানে কিভাবে রাতারাতি সমস্ত বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় তুলে দেওয়া হল, সেটা এখন ইতিহাস। আমরা তার বিস্তৃত বিবরণে যাচ্ছি না। শুধু গোয়ালপাড়ার সফল অসমিয়াকরণ যে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে হয়নি, তার প্রমাণ হিসাবে স্বাধীনতার আগেকার গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি স্থানীয় নেতাদের মানসিকতার দু'একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব। রাজা প্রতাপচন্দ্র বরুয়ার নেতৃত্বে গোয়ালপাড়ার জমিদাররা ১৯২১ সালেই লর্ড চেমসফোর্ডের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে ঐ জেলাকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন। আরেকজন নেতা, মুকুন্দনারায়ণ বরুয়া ১৯২৯ সালে সাইমন কমিশনের কাছে লিখিত দাবি জানিয়েছিলেন যে "The law, language and the social customs of the area concerned justified the transfer of permanently settled parts of Goalpara to Bengal". এই তো গেল স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের মনোভাব। ইমিগ্রান্ট মুসলমানদের প্রতিনিধি, পশ্চিম গোয়ালপাড়া আসন থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য, মতিউর রহমান মিয়া ১৯৩৮ সালে আসাম এসেমব্লিতে বলেছিলেন : We are Bengalees. Our mother tongue is Bengali... Under the circumstances

if this Assamese language be imposed as a new burden on our shoulders, or on our chidlren's shoulders and if we are deprived of our mother tongue, then that will amount to depriving our children from opportunities of education. ১৯৪০ সালে বাগমারিতে অনুষ্ঠিত গোয়ালপাড়া প্রজা সম্মেলনে একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল। এই প্রতিরোধও কিন্তু গোয়ালপাড়া জেলার অসমিয়াকরণ আটকাতে পারেনি। কেন পারেনি, সেই অভিজ্ঞতা থেকে বরাক উপত্যকার মানুষের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

গোয়ালপাড়ার সাফল্যই বরাক উপত্যকায় অসমিয়াকরণের প্রয়াস চালানোর ব্যাপারে ইন্ধন যুগিয়েছে। আঘাত ও আক্রমণ এখনও অব্যাহত রয়েছে, তার আকার- প্রকার আরো তীব্রতর হওয়ার সমস্ত লক্ষণ পরিদৃশ্যমান। আসামের রাষ্ট্রক্ষমতা এমন এক শক্তির আজ করায়ত্ত যার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই, সংখ্যালঘুদের সংবিধানসম্মত মৌলিক অধিকারের প্রতি কোনোরূপ আনুগত্য নেই, কথা ও কাজে সে প্রকাশ্যেই সংকীর্ণতাবাদী এবং আঞ্চলিক।

রাষ্ট্রশক্তির সার্বিক আনুকূল্যের সুযোগ নিয়ে আজ তাই বরাক উপত্যকার ভাষিক পরিচিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার অধিষ্ঠানের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাটি সংকীর্ণতাবাদীদের নূতন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এ উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলা নিরবচ্ছিন্নভাবেই অন্তত সহস্র বৎসর ধরে বঙ্গীয় রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল, অতএব এই এলাকার ভাষিক পরিচয় সর্বপ্রকার বিতর্কের উর্ধ্বে। বিতর্ক তোলা হয়েছে প্রাচীন কাছাড় রাজ্যের সমতলীয় অংশ সম্পর্কে, অর্থাৎ শিলচর ও হাইলাকান্দি মহকুমা সম্পর্কে। সমতলীয় কাছাড়ের কথ্যভাষার চরিত্র নির্ণয় করেছেন গ্রিয়ার্সন বা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিত, এবং বঙ্গভাষার আঞ্চলিক রূপটির চরিত্র সম্পর্কে সহমত হয়েছেন বাণীকান্ত কাকতি বা ডিম্বেশ্বর নিওগের মতো ভাষাবিদ। কথায় আছে যে 'জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেখানে পদক্ষেপ করতে ভয় পান, মুর্খেরা সেখানে অবলীলায় পা বাড়ায়।' ভাষা সাম্রাজ্যবাদের মূর্খ ফেরিওয়ালারা আজ সেই কর্মেই ব্রতী হয়েছেন।

ডিমাসা কাছাড়ী রাজারা মাইবাং-এ নেমে আসার পর থেকেই সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলাকে তাদের রাজকীয় কার্য পরিচালনার ভাষা হিসাবে ব্যবহার করেছেন, তার অকাট্য লিপি প্রমাণ বর্তমান। ডিমাসা রাজাদের মাইবাং বাসকালীন সর্বপ্রাচীন যে লিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা ১৫৭৬ সালের (শক ১৪৯৮)। রাজা মেঘনারায়ণদেব কর্তৃক উৎকীর্ণ ঐ লিপির পাঠ হচ্ছে "শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুক্ত মেঘনারায়ণদেব হাচেঙ্গসা বংশত জাত হৈ পাথরে সিঙ্গদ্বার বান্ধাইলেন"। এই বাক্যবন্ধ (ক্রিয়াপদের ব্যবহার সহ) নিশ্চিতই শ্রীহট্টের আঞ্চলিক বাংলা। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ডিমাসা রাজা সুরদর্পনারায়ণের আমলে ভুবনেশ্বর বাচস্পতি নারদীয় রসামৃত অনুবাদ করে রাজসভায় সম্মান লাভ করেন। সে অনুবাদের ভাষা বংলা। ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে বড়খলার মনিরাম লস্করকে উজির নিযুক্ত করে ডিমাসা রাজা যে সনদ প্রদান করেন, তার ভাষাও বাংলা। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (১ম পর্ব) গ্রন্থে ঐ সনদের পূর্ণপাঠ উদ্ধৃত রয়েছে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে (১৭১৩ শক) হাইলাকান্দির আলগাপুর অঞ্চলে যুবাইমিয়া, নুনুমিয়া, খলিল মাঝার লস্কর, শ্রীমঙ্গল মাঝার ভূঞা প্রভৃতিকে জমিদানের দলিলের ভাষা নিম্নরূপ ঃ 'এই জঙ্গলের চর্তুসীমা পূর্বে ওম্বক নদী, পশ্চিমে আলগাপুর উত্তরে শিবরখাল, দক্ষিণে বাঙ্গালি নদী খালের মধ্যে বসিতে দিলাম।' সুরদর্পনারায়ণের আমলে ডিমাসা রাজাদের আইন লিপিবদ্ধ হয়, মাহরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে তা সংস্কার করা হয়। এটাও বাংলায় রচিত। বড়খলার রায়বাহাদুর বিপিন দেবলস্কর (পূর্বে উল্লিখিত মণিরাম লস্করের বংশধর) ঐ আইন গ্রন্থটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে ডিমাসা কবি চন্দ্রমোহন বর্মণ সুললিত ভাষায় দীর্ঘ কাব্য রচনা করেছেন ঃ যার ভাষা নিম্নরূপ:

হেড়ম্ব রাজার কথা জিজ্ঞাসিলা তুমি
মন দিয়া শুন কহি অপূর্ব কাহিনী।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে বাংলায় গান রচনা করেছেন :

আমি তোমার তুমি আমার মাও সর্বলোকে জানে
গলার পলিতা যেন না ছাড়ে ব্রাহ্মণে
চৌদিকে অরণ্যের মধ্যে মাও তোমার নামটি জাগে
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজে তোমার চরণ মাগে।

তার পরবর্তী রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রচিত গান :

আমরা গোপিণী বিরহে তাপিণী
বিদায় দিওনা শ্যাম নিদয় হওনা
ছাড়িয়া বন্ধুগণ লইলাম শরণ
স্নেহশূন্য বাক্য বলিও না।

১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তার ভাষা:

" আমার মুলুকের লোক আমার মূলুকে যাইতে পারে না তুমার মুলুকের লোক আসিতে না পারে এই বিষয়ে গরীব লোকের নালিশ নিমিত্তো তুমার উকিল শ্রীখুসালরাম দত্তকে পত্র দিয়া তোমার নিকট পাঠাইতেছি।"

শেষ ডিমাসা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের চিঠির ভাষা :

"ব্রহ্মার লোক সহকারে মণিপুরীরা অসংখ্য ফৌজ লৈয়া ঐ মণিপুরের শ্রীযুত মারজিত সিংহ রাজা আসিয়া আমাদের দেশে প্রায় আমল করাতে উহার সঙ্গে যুদ্ধ করণের অসামর্থ অতএব গোচর করি শত্রু নিগ্রহকরি দেশ আমল করিবেন ....।"

অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে ষোড়শ শতাব্দী থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবেই বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা এবং সংস্কৃতির ভাষা বাংলা এবং ডিমাছা শাসকদের পৃষ্ঠাপোষকতা ও আগ্রহেই বরাক উপত্যকায় এই ভাষা সার্বিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অসমিয়া শিক্ষিত সমাজের কাছে এ তথ্যগুলো নূতন কিংবা অপরিচিত নয়। কারণ তথ্যগুলো অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত', উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রণীত 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' ও দেবব্রত দত্ত প্রণীত Cachar District Records বইতে রয়েছে এবং এই বইগুলো অসমিয়া বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' বইটি তো প্রয়াত জয়ভদ্র হাগজেরের শিক্ষামন্ত্রিত্বের আমলে অসম প্রকাশন পরিষদই পুনরায় ছাপিয়েছেন এবং পুনর্মুদ্রিত এই সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীমতী নিরুপমা হাগজের।

আসামের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডঃ হেড়ম্ব বরপূজারী তাই কিছুদিন আগে Assam Tribute পত্রিকায় এক প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় লিখেছিলেন যে ঐতিহাসিক যুগের কোন পর্যায়েই সমতলীয় কাছাড়ের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল না। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক ডঃ বরপূজারী তাঁর দিগন্ত বিস্তৃত পাণ্ডিত্য নিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত, পুঁথিপথের সঙ্গে সম্পর্কহীন

কতিপয় অর্বাচীন তাকে খণ্ডন করতে আগ্রহী হয়েছেন। এতেই বোঝা যায় যে আজকের আসামে লঘুগুরু জ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে।

তাই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ব্রিটিশ আমলে বাংলা ভাষা এ উপত্যকায় হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যে কাছাড়ের তৎকালীন সুপারিনটেনডেন্ট টি ফিসার (T. Fisher) লিখেছিলেন "The entire instruction in this district to be conveyed in Bengali." (জুন, ১৮৩৪)। ফিসার সাহেব এ উপত্যকার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন মাত্র, নতুন করে কিছু আরোপ করেননি।

এ আলোচনায় অন্বিষ্ট কোনো ব্যাপক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটানো নয়, বস্তুত বরাক উপত্যকার ভাষিক চরিত্র নিয়ে কোন বিতের্কর অবকাশই নেই, বিতর্কের অবকাশ নেই আসাম রাজ্যের বহুভাষিক চরিত্রের পটভূমি সম্পর্কেও। এ আলোচনার লক্ষ্য এ উপত্যকার মানুষকে আশ্বস্ত করা যে প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে আমাদের কোন বিপদ সম্ভাবনা নিহিত নেই, বরঞ্চ প্রাচীন ইতিহাসই আমাদের দুর্গ। আজকের আগ্রাসী সাংস্কৃতিক আক্রমণ প্রতিরোধে আমাদের সাফল্য নির্ভর করবে সে ইতিহাসকে বর্তমানের প্রয়োজনে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব তার উপর। আসাম রাজ্যের বর্তমান রূপটি একটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রবাহের পরিণতি এবং সেই প্রবাহের অনিবার্য অবশেষ হিসবেই এই রাজ্যে আমাদের সমব্যথী আরো বহু সংখ্যক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বর্তমান। তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের প্রয়াসের সমন্বয় সাধনের প্রশ্নটা খুবই জরুরি। এতাবৎ কার্যকরভাবে সে উদ্যোগ কখনও নেওয়া হয়নি। আবার বরাক উপত্যকার মানুষের আভ্যন্তরীণ সংহতির প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ লক্ষণ আজ প্রকাশ্যেই দৃষ্টিগোচর যে এ উপত্যকার ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলি আজ নানাধরনের সংশয়ের দোলায় দোলায়মান এবং কিয়ৎ পরিমাণে বিভ্রান্ত। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এ উপত্যকার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিসাবে বঙ্গভাষীরা তাদের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র ভাষিকগোষ্ঠী সমূহের আস্থা অর্জনে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। এ ব্যর্থতার দায়িত্ব যে আমাদেরই তা স্বীকার করে নিতে হবে এবং যে কোন স্বার্থত্যাগের বিনিময়েই সে আস্থা অর্জনের প্রয়াস সর্বপ্রযত্নে চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া আজকের বরাক উপত্যকায় অন্য কিছু কিছু বিভাজন রেখা সুস্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং শহর-গ্রামের বিভাজনকে কাজে লাগিয়েই গোয়ালপাড়ায় অসমীয়াকরণের কাজটি শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছিল এবং সে প্রয়াস যে এখানেও প্রবল উদ্যম চলছে, তা আজ আর কারো দৃষ্টির অগোচরে নেই। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে আভ্যন্তরীণ বিভাজন সমাজের বিভাজিত প্রত্যেকটি অংশেরই সমূহ সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ইতিহাসের এই শিক্ষাটি যেন কোন অবস্থায়ই আমরা বিস্মৃত না হই। ◆

একষট্টির ভাষা সংগ্রাম

পরিতোষ পালচৌধুরী

একষট্টির ভাষা সংগ্রামের রয়েছে বিস্তৃত প্রেক্ষাপট। লেখক বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও নথিপত্র তুলে ধরে এখানে দেখিয়েছেন বাংলা ভাষাচর্চা ও শিক্ষালাভের অধিকারকে কীভাবে হরণ করার চেষ্টা হয়েছিল। বরাক উপত্যকার জনতা সমস্ত চক্রান্তজাল ছিন্ন করতে কীভাবে দুর্বার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এবং কীভাবে গণ-উত্থানকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল তৎকালীন সরকার ও প্রশাসন।

রাজ্যটির নাম যেহেতু আসাম, সেজন্য ভারতবর্ষের অপরাপর জনগোষ্ঠী সহজেই ধারণা করে নেন, এটা অসমিয়াদের দেশ এবং এই দেশটা বাঙালি, বিহারী ও নেপালিরা এসে দখল করে নিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত একথা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তীয় মানুষের কথা বাদ দিলেও আসামের নিকট প্রতিবেশী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এক শতাংশ মানুষও মূল সত্যের সঙ্গে পরিচিত কিনা আমার সন্দেহ আছে এবং আমি মনে করি এখানেই লুকিয়ে আছে আসামে বসবাসকারি বাংলাভাষীদের আসল সমস্যা।

১৮৭৪ সালের আগে এই রাজ্যের নাম আসাম ছিল না। ইংরেজ আসামের শাসন ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে ১৮২৬ সনে। কিন্তু সেটা বর্তমান আসাম নয়। আসাম সীমান্তে তখন অনেক রাজ্য— আহোম, চুতিয়া,কামতা, কাছাড় ইত্যাদি কত কি? ইংরেজ ১৮২৬ সনে বর্মা যুদ্ধের পর ইয়াণ্ডাবু চুক্তি মতে যে আহোম রাজ্যের শাসনক্ষমতা অধিগ্রহণ করে, তা ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মাত্র পাঁচ জেলা নিয়ে। এই জেলাগুলি হল কামরূপ, দরং, শিবসাগর, লক্ষীমপুর এবং নগাঁও। নগাঁও জেলার বর্তমান হোজাই মহকুমা সেদিন কাছাড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সুতরাং ১৮২৬ সনে ইংরেজ যে আহোম রাজ্য দখল করে সেখানে কাছাড় ছিল না। তারা কাছাড়ের শাসন ক্ষমতা লাভ করে আহোম রাজ্য নেবার ছয় বছর পর ১৮৩২ সনে। ঐ সময় কাছাড়ের আয়তন ছিল বিশাল এবং বরাক উপত্যকার কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা, কারবিআংলং জেলার হামরেন মহকুমা, নগাঁও জেলার হোজাই মহকুমা সহ উপরে ধানশিরি পর্যন্ত ১৮৩২ এর কাছাড় রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

১৯৬১ ইংরেজিতে যে কাছাড় জেলায় বাংলা ভাষা সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই কাছাড়ও আবার

ইংরেজ অধিগৃহীত কাছাড় নয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিন থানা কাছাড় সীমান্তে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কাছাড় জেলার একটি মহকুমা বলে গণ্য হয়। একষট্টির কাছাড় জেলার তিন মহকুমা আজ তিনটি জেলা এবং একত্রে 'বরাক উপত্যকা' বলে পরিচিত।

১৮৭৪ সালে শিলং এ রাজধানী স্থাপন করে ইংরেজ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পাঁচ জেলা এবং গারো পাহাড় ও খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় নিয়ে একটি চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ গঠন করে। প্রদেশের নামকরণ হয় Assam (আসাম)। ইংরেজ এই আসাম নামের ধারণা কোথা থেকে পেয়েছিল জানি না। তবে যে আহোম রাজ্য ওরা দখল করেছিল সেই আহোমরা বার্মার শান উপত্যকা থেকে নাগাপাহাড়ের পাতকই পর্বত পেরিয়ে শিবসাগরের সমতলে পৌঁছে বিস্তীর্ণ দিগন্ত প্রসারি সমতল অঞ্চলকে মনের আনন্দে বলে ওঠে আস-সাম্ অর্থাৎ কি সুন্দর, কি অপূর্ব। অপূর্ব সেই উপত্যকায় আহোমরা বসতি স্থাপন করে। গড়ে ওঠে তাদের রাজত্ব। তারপর একটির পর একটি ছোট ছোট রাজ্য বিজয়। শেষ পর্যন্ত গৌহাটি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জয় করে রাজধানী স্থাপন। কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আহোম রাজ্যের সর্বশেষ রাজধানী হলেও এর সঙ্গে পৌরাণিক ভগদত্ত বা নরকাসুরের রাজ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। আহোমরা মাত্র ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আসামে প্রবেশ করেছে এবং বাহুবলে ক্ষমতা অর্জন করেছে।

১৮৭৪ সালে শিলং এ রাজধানী স্থাপন করার পর দেখা গেল ওটা একটা আর্থিক অনির্ভর রাজ্য, রাজ্যের আয় দিয়ে রাজ্য চালানো সম্ভব নয়, তখন বাংলাদেশের শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া জেলা এবং ১৮৩২ সনে অধিগৃহীত কাছাড় রাজ্য, যা ইংরেজ কর্তৃক ঢাকা (প্রেসিডেন্সি) থেকে শাসিত হত, সেই কাছাড়কে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং এই সংযুক্তির ফলে আসাম একটি উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়। শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া নিয়ে বৃহত্তর আসাম গঠনের পর আসামকে দুটি উপত্যকায় ভাগ করা হয়; সুরমা উপত্যকা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।

শ্রীহট্ট কাছাড় নিয়ে ছিল সুরমা উপত্যকা। সুরমা উপত্যকার সদর ছিল শিলচর। ১৯৪১ সালের যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য দেশে জনগণনা হয়নি। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পূর্বে জনগণনা সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতে হলে আমাদের যেতে হয় ১৯৩১ সালের জনগণনায়। আসুন ১৯৩১ সালে জনগণনা আসামের জনবিন্যাস সম্পর্কে কি বলে দেখা যাক :

১৯৩১ সালে আসামের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ :

সুরমা উপত্যকা

বঙ্গভাষী	২৮,৪৮,৪৫৪
অসমিয়াভাষী	৩,৬৯২

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

অসমিয়াভাষী	১৯,৭৮,৮২৩
বাংলাভাষী	১১,০৫,৫৮১

আসামের মোট জনসংখ্যা

বঙ্গভাষী	৩৯,৬০,৭১২
অসমিয়াভাষী	১৯,৯২,৮৪৬
পার্বত্য অধিবাসী	১২,৫৩, ৫১৫
সর্বমোট	৭২,০৭,০৭৩

ইংরেজ শাসিত এই পরিসংখ্যানে কোনো কারচুপি এজন্য থাকার কথা নয় যে জনসংখ্যার নিরিখে জনপ্রতিনিধিত্ব

অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্বের রাজনীতি সেখানে অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং নিরপেক্ষ ঐ আদমসুমারির ফলাফল আমাদের এক ব্যাপক আত্মসমীক্ষার সুযোগ এনে দেয়।

১৯৪৭ -এর ১৫ আগস্ট দেশ বিভাগ হল। আসামের শ্রীহট্ট জেলা করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিনথানাকে ভারতে রেখে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। করিমগঞ্জ এবং কাছাড়ের মিলিত লোকসংখ্যা তখন ৬ লক্ষ। অতএব ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম জনগণনায় আসামের বঙ্গভাষীর সংখ্যা হওয়া উচিত :

১। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ১১ লক্ষ বাংলাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে (বিশ বছরে) অন্যূন ১৫ লক্ষ।

২। কাছাড় এবং করিমগঞ্জের ৬ লক্ষ

৩। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আবাদীর জন্য নিয়ে আসা ৬ লক্ষ ইমিগ্রেন্টস বাঙালি মুসলমান বৃদ্ধি পেয়ে ৮ লক্ষ।

৪। দেশ বিভাগের জন্য আসা উদ্বাস্তু ১০ লক্ষ।

সর্বমোট ৩৯ লক্ষ।

১৯৫১ সালে যেখানে আসামে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা অন্যূন ৩৯ লক্ষ হওয়া উচিত ছিল, সেখানে ৫১-র গণনায় আসামে ৪০ লক্ষ বাঙালির সংখ্যা কমে হল ১৭ লক্ষ এবং ২০ লক্ষ অসমিয়াভাষীর সংখ্যা বেড়ে হল ৪৯ লক্ষ। আসামের তৎকালীন সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট এটাকে বলেন 'বায়োলজিক্যাল মিরাকল' অর্থাৎ জীবতাত্ত্বিক বিস্ময়।

কিন্তু সেন্সাস রিপোর্টে লোক কমিয়ে দেখালেই তো আর লোক কমে গেল না। মানুষগুলো তো সশরীরেই আসামের মাটিতে চাষাবাদ করছে, চাকুরি করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। সুতরাং সংখ্যাতত্ত্বের একটা ড্রাগন উগ্র অসমিয়াদের তাড়া করে বেড়াতই। তাই শ্রীহট্ট জেলাকে গণভোটের প্রহসনের মাধ্যমে পাকিস্তানে পাঠিয়েও শান্তি ছিল না অসমিয়া নেতৃত্বের। সুতরাং বাংলাভাষীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার একটা চেষ্টা স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই শুরু হয়। দেশ বিভাগের মাত্র ২৫দিন আগে ৪৭ এর ১৯ জুলাই গৌহাটিতে শ্রেষ্ঠ অসমিয়া চিন্তানায়ক বাণীকান্ত কাকতি একটি সভায় বলেছিলেন — Culturally, recially and linguistically, every non-Assamese is a foreigner in Assam. In this connection we must bear in mind that Assam from very ancient times never formed a part of India.

ইংরেজি দৈনিক আসাম ট্রিবিউনের ২০ জুলাই তারিখের সংখ্যায় এই ভাষণ মুদ্রিত হয়। তারপর দেশ বিভাগ হল। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৭-এর ৫ নভেম্বর আসামের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনে মন্ত্রীসভার তৈরি করে দেওয়া ভাষণ পাঠ করে রাজ্যপাল ঘোষণা করলেন :

"The Native of Assam are now masters of their own house. They have a Government which is both responsible and responsive to them. They can take what steps are necessary for the encouragement and propagation of Assamese language and culture and the languages and customs of the tribal people who are their fellow citizens and who also must have a share in the formation of such policies. The Bengalee has no longer the power, even he had the will to impose anything on the people of these hills and valleys which constitute Assam.The basis of such feeling against him as exist is fear but now there is no cause of fear. I would therefore appeal to you to exert all the influence you posses to give the stranger in our midst

a fair deal provided of course he in his turn deals loyally with us."

উক্ত দর্শন হাতে নিয়েই আসামে বাঙালি তরণী উথাল পাথাল ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এক সাগর পাড়ি দিয়ে চলল। শ্রীহট্টবাসী সরকারি কর্মচারী যারা আসাম সরকারেরই কর্মী ছিল, তারা হিন্দুস্তান পছন্দ করে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার পর চাকরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈর কাছে এলে তিনি বলেন "Undoubetedly Assam is for Assamese" শিলং টাইমস পত্রিকার ১৯ অক্টোবর ১৯৪৭ তারিখে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বলেন "If Assam is for Assamese, India belongs to whom?" রাজ্যের বাংলাভাষীরা একটা ভরসা পেয়েছিলেন, অন্তত জাতির জনক আছেন তাদের পেছনে। অসমিয়া ভাষার গান গেয়ে, অসমিয়া ভাষায় কথা বলে অসমিয়া জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা নিজেদের শরিক করে নিয়েছিলেন। অসমিয়া ভাষা রাজ্যের প্রধান ভাষা নয় বা অসমিয়া ভাষা অপর কোনো ভাষাগোষ্ঠীর চেয়ে দীন—এমন ধারণা রাজ্যের কোনও বাংলাভাষীর মনে কস্মিনকালেও দেখা দেয়নি। পক্ষান্তরে বরং একটা অঘোষিত ভঙ্গিতে অসমিয়া ভাষা রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েই চলছিল। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না অসমিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী পক্ষ। বঙ্গভাষী জনসংখ্যার প্রকৃত শক্তি বোধ হয় তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। ১৯৫৪ সালে তাই গোয়ালপাড়া জেলায় অনুষ্ঠিত হল 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন। আন্দোলন মানে সভা-সমিতি-মিছিল হরতাল নয়। এ আন্দোলন ১৯৫৪-র মারো-কাটো জ্বালিয়ে দাও জাতীয় বন্য উন্মাদনা। কিন্তু এই উন্মাদনা গোয়ালপাড়া জেলার বাইরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্তৃতি লাভ করেনি। কিন্তু ১৯৬০ সালে অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদার দাবিতে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে আরম্ভ হল এক নারকীয় তাণ্ডব। অসমিয়া ভাষা রাজ্যের সরকারি ভাষা হবে— ভালোকথা, কোনো বাংলাভাষী এর বিরোধী নয়। তাহলে বাঙালির গৃহদাহ কেন? কেন শিশুহত্যা, নারীহত্যা, নরহত্যা এবং লুণ্ঠন? কিন্তু তাই হল সমগ্র রাজ্যজুড়ে। কেবলমাত্র সরকারি হিসাবেই ১৩১৯৫টি বাড়ি ভস্মীভূত হয়, ৪০ জন মারা যান এবং ১৬২৫০ পরিবার অর্থাৎ প্রায় একলক্ষ মানুষ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। সরকারি এই হিসাবের মধ্যে— যারা নিজেদের ক্ষমতায় অন্যত্র সরে গেল বা আত্মীয়বাড়ি গিয়ে উঠল, সেই হিসাব কিন্তু নেই। সুতরাং ৬০ সালে কি হয়েছিল সহজেই অনুমেয়।

শিলঙে অল পার্টি ছিল লিডারস কনফারেন্স গণতান্ত্রিক ভঙ্গিতে অসমিয়া ভাষাকে একক সরকারি ভাষা করার প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু কাছাড় থেকে অসমিয়া ভাষাকে সরকারি ভাষা না করার মতো কোনো স্লোগান কোথাও ওঠেনি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নারকীয় দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হলেও কাছাড়ে তার প্রতিবাদের ভাষা একদিনের জন্যও কোনো অশোভন পথে ধাবিত হয়নি। প্রতিশোধের ভাষা এখানে ছিল না। একান্ত সংবিধান সম্মত গণতান্ত্রিক পথে কাছাড় ছিল বিচরণশীল। কাছাড়ের বঙ্গ ভাষাভাষী সমাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ বাঙালিদের ভোটে কাছাড় থেকে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী চালিহা নিশ্চয়ই ততখানি অবিবেচক হতে পারবেন না। মুখ্যমন্ত্রী চালিহা তার নিজের কেন্দ্র উপর আসামের নাজিরা আসনে— আর সি পি আই প্রার্থী খগেন বরবরার হাতে পরাজিত হন। সেই পরাজিত চালিহাকে কাছাড়বাসী বদরপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত করেন। ১৯৫৭-র নির্বাচনের পর একটি নির্বাচনী মামলায় ঐ আসনটি শূন্য হয়ে যায় এবং উপনির্বাচনে বিমলাপ্রসাদ চালিহা এখান থেকে বিজয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদ বহাল রাখতে পারেন। তাই সঙ্গতভাবেই রাজ্যের বাঙালিরা মনে করেছিলেন যে অন্তত বিমলাপ্রসাদ চালিহার হাতে তাদের মৌলিক অধিকার কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না।

কিন্তু রাজ্যের বঙ্গ ভাষাভাষীদের সেই প্রত্যাশা বানের জলে ভেসে গেল। বিশেষ করে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যখন কড়া ভাষায় প্রস্তাব নিয়ে অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যের একক সরকারি ভাষা করতে বলল— তখন রাজ্যের বাঙালি মনে দেখা দিল দুশ্চিন্তার ছায়া। অর্থমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আহমেদ তাঁর বাজেট ভাষণে

বললেন : "Particularly after the Assam provincial Congress Committee had passed a resolution for declaring Assamese as the official language of the state, spoilt the atmosphere of peace and amity which prevailed in Assam."

কাছাড় জেলার বুদ্ধিজীবী তথা রাজনৈতিক সচেতন মহল নড়েচড়ে বসলেন। ২ ও ৩ জুলাই ১৯৬০ সালে শিলচর গান্ধীবাগে অনুষ্ঠিত হল নিখিল আসাম বাংলা ভাষা ও অনসমিয়া ভাষা সম্মেলন। সম্মেলনের সভাপতি প্রখ্যাত সাংবাদিক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, এম পি। বিশাল এই সম্মেলনে গণকণ্ঠ উচ্চারিত হয় — বাংলাকে আসামের দ্বিতীয় সরকারি ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। সম্মেলন দাবি জানাল চালিহা সরকার যেন তড়িঘড়ি না করেন এবং দাঙ্গাবাজদের কাছে যেন নতি স্বীকার না করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চালিহা দাঙ্গাবাজদের কাছেই নতি স্বীকার করলেন এবং ২৪ অক্টোবর আসাম বিধানসভায় অসমিয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে পাশ করিয়ে নিলেন। রাজ্যের সরকারি ভাষা সম্পর্কে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন, তার প্রতি সামান্য মর্যাদাও প্রদর্শন করলেন না। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বলেছিলেন : " We do not desire to make any recomendation about the details of the policy to be followed in prescribing the use of the minority languages for official purpose. However, we are inclined to the view that a state should be treated as unilingual only where one language group constitutes about 70 percent or more of its entire population. When there is a substantial minority constituting 30 percent or so of the population, the state should be recognised as bilingual for administrative purposes."

(State Recognisation Commission Report, Page 211 Sec 733).

কিন্তু ৭০ ভাগ তো দূরের কথা জনগণনায় বিপুল কারচুপি করেও অসমিয়াভাষী জনসংখ্যা কত পার্সেন্টে পৌছতে পেরেছিল রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের ভাষাতেই শুনুন :

"The linguistic complextion of the existing state establishes very clearly its composite character inspite of the very interesting post 1931 spread of Assamese according to the census figures. It is no surprising that the rapid increase in the past two decades in the number of persons speaking Assamese has been disputed and the veracity of 1951 census figures has been questioned incertain quarters. We have not deemed it necessary to enter into this controversy but we would like to draw attention to the fact that inspite of this increase the Assamese speaking population still constitutes only about 55 percent of the population of the state."

(State Recognisation Commission Report, paragraph-719).

এই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। এই ঘটনার বিরুদ্ধেই ১৯৬১ সালে গর্জে ওঠে কাছাড়ের যৌবন। শান্তিপূর্ণ, নিরস্ত্র, অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এবার খুব সংক্ষেপে এই আন্দোলনের কথা বলছি।

১৯৬০-র ৫ নভেম্বর করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় জনসম্মেলন। সেই সম্মেলনে গঠিত হয় গণ সংগ্রাম পরিষদ। গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে দীর্ঘ সাড়ে তিন মাসের অধ্যবসায়ে গড়ে ওঠে এক দুর্বার গণ সংগঠন। গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ৫০ হাজার সত্যাগ্রহী সংগ্রামের প্রথম দিন ১৯মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অবিভক্ত কাছাড় জেলার প্রতিটি সরকারি কার্যালয়ের দরজায় এবং রেলপথে। ১৯ মে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সরকারি প্রশাসন যন্ত্র। এমন

সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের দাপট এর আগে আর কেউ প্রত্যক্ষ করেননি এ জেলায়। এখানে উল্লেখ্য ১৯মে'র এক সপ্তাহ আগে থেকেই শিলচরের রাজপথে আর্মি রুট মার্চ আরম্ভ করে। শিলচরের ছাত্র ও যুব শক্তি তাদের এই ভয় দেখানোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল।

এই নৈতিক পরাজয় বোধহয় সহ্য হচ্ছিল না শাসকগোষ্ঠীর। কাছাড়ের জেলাশাসক বি. দোয়ারা যে কোনো পরিস্থিতিতে গুলিচালনার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট দের বলে দিয়েছিলেন, কোনো অবস্থায়ই যেন গুলির হুকুম না দেওয়া হয়। জেলাশাসক নিজে সর্বাধিক স্পর্শকাতর সত্যাগ্রহ কেন্দ্র রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বেলা দুটো পর্যন্ত। দুটোর সময় তিনি খেতে চলে যান তাঁর বাংলোয়। এই সুযোগ নিয়ে নেয় সরকার পক্ষের অতিভক্ত সুযোগ সন্ধানীরা। যখন চারিদিকে শান্তি বিরাজিত, সত্যাগ্রহীরা যার যার কেন্দ্রে গল্পগুজবে ব্যস্ত, যখন সাধারণ মানুষও নিশ্চিন্ত যে যাক্ ভালোয় ভালোয় কেটেছে দিনটি। আর মাত্র দেড় ঘণ্টা বাকি—তারপরই আজকের মতো সত্যাগ্রহ শেষ, এরকম একটা পরিস্থিতিতে বেলা ২-৩৫ মিনিটে আচমকা শিলচর রেল স্টেশনে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। এই গুলিবর্ষণের ফলে শহিদ হন — (১) কমলা ভট্টাচার্য (২) শচীন্দ্র পাল, (৩) সুকোমল পুরকায়স্থ, (৪) চণ্ডীচরণ সূত্রধর, (৫) সতেন্দ্র দেব, (৬) কুমুদ দাস, (৭) তরণী দেবনাথ, (৮) বীরেন্দ্র সূত্রধর, (৯) কানাইলাল নিয়োগী। (১০) হিতেশ বিশ্বাস, (১১) সুনীল সরকার। মারাত্মকভাবে আহত হন ত্রিশজন। স্বাধীন ভারতে জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা, কবিগুরুর মাতৃভাষা, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় শহিদ হলেন এগারো জন।

গুলিচালনার পর ১৯ মে সন্ধ্যায় সান্ধ্য আইন জারি করে সরকার। কিন্তু ২০ মে প্রত্যুষে সেই কারফিউ ভেদ করেই শহরে বিলি হতে থাকে সংগ্রাম পরিষদের বুলেটিন। ২১মে কারফিউ ভঙ্গ করে শহরে বেরিয়ে পড়ে প্রভাত ফেরি। রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের সদ্য লেখা গান উদ্বেলিত করে তোলে প্রতিটি মানুষের মন। 'আরো প্রাণ, আরো প্রাণ, ঐ বেদীমূলে দিতে হবে বলিদান, ভাষা জননীর অপমান— রক্ত ধারায় ধুয়ে কর লয়। হবে জয় হবে জয় হবে জয়' শ্মশানপুরীর মধ্যেই কেঁপে ওঠে শিলচর। ২২ মে থেকে আবার শুরু হয় সত্যাগ্রহ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন — ১৯ মে প্রতিটি সত্যাগ্রহ কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার সত্যাগ্রহীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ রি-ইনফোর্স করে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যাচ বসিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার পরও সত্যাগ্রহে সামান্যতম ভাটা পড়েনি। ১৯মে সকালবেলা পুলিশ রেলস্টেশনে লাঠিচার্জ করে কিন্তু আঁকড়ে পড়ে থাকে সত্যাগ্রহীরা। পূর্বাহ্নে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে কিন্তু সত্যাগ্রহীদের লাইনচ্যুত করা সম্ভব হয় না। জেলা কারাগারের বাইরে শিলচর শহরে রাজ্য সরকারকে আরও তিনটি অস্থায়ী কারাগার খুলতে হয়েছিল।

১৭ জুন পর্যন্ত একটানা চলে সত্যাগ্রহ। দিল্লি থেকে নেমে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। আসাম সরকার হাইকোর্টের বিচারপতি মেহরোত্রার নেতৃত্বে শিলচর গুলিচালনা সম্পর্কে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন ঘোষণা করেন। কলকাতা থেকে এন সি চ্যাটার্জির নেতৃত্বে বেসরকারি তদন্ত কমিশন শিলচরে গুলিচালনা সম্পর্কে তদন্ত করতে আসেন। চ্যাটার্জি কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়,স্নেহাংশু আচার্য, রণদেব চৌধুরী এবং অজিত দত্ত। এন সি চ্যাটার্জি কমিশন রায় দেন — গুলিচালনা একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

মেহরোত্রা তদন্ত কমিশনের রায় আসাম সরকার প্রকাশ করেনি। কিন্তু সংবাদপত্রে বেরিয়েছে কমিশন নাকি গুলিচালনা অযৌক্তিক বলে কঠোর সমালোচনা করেছে প্রশাসনকে। রাজ্যসরকার এসব খবরের কোনো প্রতিবাদও করেনি। অর্থাৎ সংবাদ সত্য বলে মেনে নিয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় মেহরোত্রা তদন্ত কমিশনের রিপোর্টও সরকারের বিরুদ্ধেই গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যস্থতায় আসাম সরকার কাছাড় জেলার (বরাক উপত্যকা)

সরকারি ভাষা বাংলা বলে মেনে নেয় এবং ভাষা আইন সংশোধন করে।

৬১-র ভাষা আন্দোলনে শিলচরে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁরা বুক পেতে গুলি নিয়েছেন মাতৃভাষার জন্য। এরকম একটি সুসংগঠিত আন্দোলন সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীমহল তেমন কোন গবেষণাই করেননি, এটা পরিতাপজনক।

শিলচর ভাষা আন্দোলনের আরেকটি গর্ব করার দিক হচ্ছে গুলিচালনার পর হাসপাতালে শায়িত মৃতদেহগুলি বি এস এফ এসে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি সংগ্রাম পরিষদের সতর্কতার জন্য একটিও শবদেহও তুলে নিয়ে যেতে। অথচ, ঢাকার ৫২-র ভাষা আন্দোলনে অনেকগুলি মৃতদেহই সামরিক বাহিনী তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। এর থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে শিলচর তথা কাছাড়ে আন্দোলন কতখানি সুসংগঠিত ছিল। বাংলা সাহিত্যে একথারও কোনো মূল্যায়ন হয়নি আজ পর্যন্ত। পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছে একভাষী মানুষের ভূগোলে, কিন্তু ভারত তথা আসামের বহুভাষী সমাজে ভাষা সংগ্রাম করে যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, তারও কোন মূল্যায়ন করা হয়নি।

'৬১-র ভাষা আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করে কাছাড়ের সরকারি ভাষা বাংলা বলে মেনেও আসাম সরকার বরাক উপত্যকাকে অসমিয়াকরণের উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭২ সালে 'সেবা' সার্কুলারের মাধ্যমে শিক্ষার মাধ্যম অসমিয়া ঘোষণা করলে '৭২ সালে আবার কাছাড়ের মানুষকে রাজপথে নামতে হয়। করিমগঞ্জে প্রাণ দেন একজন। ১৯৮৬তে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত করিমগঞ্জ এলে 'সেবা সার্কুলার' প্রত্যাহারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে জমায়েতে পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন আরও দুইজন। অসমিয়া ভাষা শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্ন স্থগিত থাকলেও অসমিয়াকরণের সরকারি চক্রান্ত সক্রিয় এবং সর্বপ্রকার সরকারি প্রচারপত্র অসমিয়া ভাষায় পাঠানো, স্কুলে স্কুলে অসমিয়া ভাষার শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে একটা প্রচ্ছন্ন চক্রান্ত দারুণভাবে সক্রিয়। সম্প্রতি গৌহাটি হাইকোর্টের একটি সার্কুলারে বলা হয়েছে, বিচারকের চাকরি পাবার জন্য যাঁরা আসাম জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে চান তাঁদের অসমিয়া ভাষা জানতে হবে। শিলচর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন এই নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ২১ ফেব্রুয়ারি যতখানি পবিত্র এবং সম্মানের, ১৯ মে কোনও অংশে তার কম নয়। কিন্তু কলকাতায় ১৯মে ততখানি গুরুত্ব না পাওয়ায় ধীরে ধীরে বাংলার এই তৃতীয় ভুবন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং এদিকের সম্পন্ন বাঙালিরা কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গে বাড়িঘর করছেন। একটা নীরব জনস্রোত পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধাবিত। ১৯মে'র কাছাড় তথা বরাক উপত্যকাকে যদি বাংলার বুদ্ধিজীবীরা গভীর দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে না পারেন ক্ষতি শুধু এদিকের নয়, ক্ষতি তাদেরও। ◆

ভাষা সংগ্রামের চেতনা ও আমাদের উত্তরাধিকার

ইমাদ উদ্দিন বুলবুল

বরাক উপত্যকার গত একশ বছরের ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে একষট্টির ভাষা আন্দোলন। এটা এত স্বতস্ফূর্ত এবং বজ্রদৃঢ় ঐক্যের উপর দাঁড়িয়েছিল যে, ১৯ মে শহিদের মরদেহ গুম করার সরকারি চক্রান্ত ভেস্তে দিয়েছিল জনতা। অথচ আন্দোলনের গৌরবগাথা নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। সামাজিক প্রেক্ষাপটও তাদের কাছে অস্পষ্ট। ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে লেখক এখানে তা নিয়েই করেছেন নিবিষ্ট আলোচনা।

বরাক উপত্যকার গত একশ বছরের ঘটনাবলির যদি একটি তালিকা তৈরি করা হয় তবে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিই তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করবে। (১) ১৩২২ বাংলার কার্তিক মাসের প্লাবন, (২) ১৩৩৬ বাংলার মহাপ্লাবন, (৩) ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ, যার ফলে বরাক উপত্যকার সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ বন্ধ হয়ে যায়, (৪) ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলন, (৫) দেশভাগের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে বরাকে শরণার্থীদের আগমন, (৬) বরাক উপত্যকায় 'আসাম বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি।

এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার অবকাশ খুবই কম। অথচ এত সুদূরপ্রসারী একটি ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়ে থাকে। এত দীর্ঘ এক সময়সীমা পার হয়েও ঐ সংগ্রামের চেতনাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে না। এইরূপ একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ে যে পরবর্তীকালে মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব তা বিশ্লেষণ করলেই অনেক নতুন তত্ত্ব এবং তথ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে, তাই আজ ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আমাদের উচিত সমস্ত বিষয়ের একটা চুলচেরা বিচার করে দেখা।

১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেলস্টেশনে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর বিনা প্ররোচনায় গুলিচালনা করা হয়, এর ফলে এগারোটি তাজাপ্রাণ আত্মাহুতি দিল। ঐ সঙ্গে অনেক সত্যাগ্রহী আহত হলেন। যারা শহিদ হলেন,

তারা বরাকের বুকে এমন একটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, যা যুগ-যুগান্ত ধরে এ উপত্যকার মানুষকে উজ্জীবিত করবে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকারকে সচেতনভাবে একটা পূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। ৬১ সালের পর ৭২ সালের শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে ব্যাপক গণ আন্দোলন, ৮৬ সালে 'সেবা সার্কুলার' প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন হয়েছে, এবং প্রত্যেকবারই আন্দোলন সফল হয়েছে। তবু ৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন শেষ নেই। তাই ৬১ সালের আন্দোলন সম্পর্কে নানাজনের নানা মত, স্মৃতি এবং দুঃসহ বেদনার অভিব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠে।

স্ববিরোধ কিংবা পরস্পরবিরোধী হওয়া কোনও বড় আন্দোলনের ক্ষেত্রে হতেই পারে এবং কার্যত বরাকেও তা হয়েছে। কিন্তু যখন আন্দোলন শেষ হয়ে যায় এবং সেই আন্দোলনের সুফল পরবর্তী প্রজন্মগুলি ভোগ করতে শুরু করে তখন ঐ আন্দোলনের যথার্থ মূল্যায়ন শুরু হয়। সেই কারণেই ভাষা আন্দোলনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভাষা আন্দোলনে যাঁরা সেদিন অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা আজ নতুন প্রজন্মের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ঐতিহাসিক মূল্যায়নে তাঁদের ভূমিকা তুলে ধরছেন।

ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করতে হলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়েই প্রথমে পর্যালোচনা করতে হবে। আর ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মধ্য দিয়েই সংগ্রামের চেতনা, প্রাসঙ্গিকতা, উত্তরাধিকার সবকিছুই চোখের সামনে ভেসে উঠবে। নতুন প্রজন্মের কাছে উদ্ভাসিত হবে।

কিন্তু এ সব মূল্যবান দিক নির্দেশনা করার প্রাক্কালে কবি দিলীপকান্তি লস্করের কবিতাটি তুলে ধরা প্রয়োজন —

'আমি কোত্থেকে এসেছি, তার জবাবে
যখন বল্লাম :
করিমগঞ্জ, আসাম;
তিনি খুশীতে ডগমগ হয়ে বল্লেন :
বা ঃ, বেশ সুন্দর
বাংলা বলছেন তো।
একজন শিক্ষিত তথা সাহিত্যিকের
যখন এই ধারণা, তখন
আমি আর কি বলতে পারি,
ওঁকে ঠিক জায়গাটা ধরিয়ে দিতে
গিয়ে বল্লাম :
বাংলা ভাষার তেরো শহিদের ভূমিতে
আমার বাস।
তখন তিনি এক্কেবারে আক্ষরিক অর্থেই আমাকে ভির্মি খাইয়ে দিয়ে বল্লেন :
ও! বাংলাদেশ? তা-ই বলুন।'

এই কবিতার মধ্য দিয়েই আমাদের মর্মবেদনার আংশিক প্রকাশ ঘটেছে। আমরা ভাষার জন্য বারবার প্রাণ দিলাম, তবু আমাদের কোন পরিচিতি নেই। আমরা বারবার ভাষা, সাহিত্য,সংস্কৃতির কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে না দাঁড়িয়ে যেন সবসময় একটা 'নো ম্যানস্ ল্যান্ডে' দাঁড়িয়ে থাকি। আমাদের মর্মবেদনা আরও বাড়তে থাকে। তাই

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী তার 'উদ্বাস্তুর ডায়েরি' কবিতা নান্দনিক চাতুর্যে তুলে ধরে একটা আত্মপ্রবোধ দেওয়ার অপূর্ব চেষ্টা করেছেন —

' যে কেড়েছে বাস্তুভিটে,
সে-ই কেড়েছে ভয়,
আকাশ জুড়ে লেখা আমার
আত্মপরিচয়।
হিংসা জয়ী যুদ্ধে যাব
আর হবে না ভুল
মেখলা পরা বোন দিয়েছে
একখানা তাম্বুল।
এবার আমি পাঠ নিয়েছি
আর কিছুতে নয়,
ভাষাবিহীন ভালোবাসার
বিশ্ববিদ্যালয়।'

নিজেকে নানাভাবে ছদ্ম পরিচয়ে, অহমিকায়, অভিনয়ে পরিচয় দেবার পালা, সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতার কবে যে শুরু হয়েছিল তা' আজও সমান তালে চলছে। আমরা পারস্পরিক দোষারোপ করছি ঠিকই, কিন্তু সেই গড্ডালিকা প্রবাহ হতে বের হওয়ার চেষ্টা করছি না, কারো কারো মতে এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে মাত্র।

২.

অথচ ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন আমাদের আন্দোলনের গৌরবময় দিক সবার চোখের সামনে নতুন করে ভেসে উঠবে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সাফল্য ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, তা শুধু এ উপত্যকার জন্য নয়, বরং তা স্থান-কাল-পাত্র অতিক্রম করে একটি চিরন্তন প্রেরণার বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে।

১৯শে মে গুলিচালনায় দশজন শহিদের লাশ শিলচর সিভিল হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। (একজন শহিদের লাশ পরদিন স্টেশনের নিকটবর্তী পুকুরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, তাই প্রথমদিন হাসপাতালে দশজনের লাশ ছিল)। এই শহিদের লাশগুলো গুম করার জন্য সরকারি তরফে খুবই চেষ্টা করা হয়, কিন্তু শিলচরের সত্যাগ্রহীদের তৎপরতায় সরকার পক্ষ একটি লাশও গুম করতে সক্ষম হয়নি। কিভাবে সরকারের পুলিশবাহিনীর সন্ধানী চোখগুলো থেকে শহিদের লাশগুলো আড়াল করে রাখা সম্ভব হয়, তা এক দীর্ঘ ইতিহাস।

এই একটি অসামান্য ঘটনা থেকেই সেদিনের সর্বব্যাপী আন্দোলনের একটি রূপরেখা আন্দাজ করা যায়। অথচ ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ঢাকার রাজপথে পাকিস্তানি বাহিনী যাদের গুলি করে হত্যা করেছিল, তাদের অনেকেরই লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক কোন বিষয়ের উপর বর্তমান নিবন্ধকারের এই লেখনি যাতে কোন মনগড়া তথ্য অথবা কল্পনাবিলাস না হয়, সেজন্য ৫২ সালের বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান) ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বশীর আল হেলাল সম্পাদিত 'ভাষা আন্দোলনের

ইতিহাস' (প্রকাশক— বাংলা একাডেমি,ঢাকা) থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল—

'আলি আহাদ লিখেছেন — ... 'পুলিশের গুলি শুরু হয় আনুমানিক তিন ঘটিকার পর। নিহত হন আবুল বরকত, সালাহ উদ্দীন, জব্বার, শফিউর রহমান ও নাম না জানা আরও কয়েকজন। ছাত্র হত্যার খবর দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়ে। ঢাকা শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অফিস, আদালত এবং যানবাহন ধর্মঘটে নামিয়া আসে।'

২১ শে ফেব্রুয়ারির গুলিচালনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সকল বিবরণ নথিভুক্ত করার পর ঐ গ্রন্থের সম্পাদক আল হেলাল সাহেব লিখেছেন—'২১শে ফেব্রুয়ারি ঠিক কতজন মারা যান, তা জানার আজ আর উপায় নেই। পুলিশ অবশ্যই লাশ সরিয়েছিল। এই দিন কে কে শহিদ হন, তাই নিয়েও মতান্তর রয়েছে। সালাহ উদ্দিনের নাম সবাই বলেননি। কে প্রথম শহিদ হন, তাও বলা সহজ নয়।' (ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পৃঃ ৩২৭)

এই একটি তুলনামূলক বিচারে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে ৬১ সালের বরাকের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব কত সংগঠিত ছিল। আসাম সরকারের পুলিশ একজন শহিদের লাশও সরিয়ে ফেলতে অথবা গুম করতে পারেনি। অথচ বাংলাদেশের ২১শে ফেব্রুয়ারি কতজন শহিদ হয়েছিলেন, তা সঠিকভাবে বলার উপায় সেদিনও ছিল না, আজ তো আর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কোন সম্ভাবনাই নেই।

কিন্তু বরাকের মানুষের দুর্ভাগ্য হল যে এত গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও প্রকাশিত হল না। এজন্য আমাদের সীমাহীন আলস্যই মূলত দায়ী। সত্যিকারের ইতিহাস প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকই যে বিবেকের কাছে দোষী, সেই সত্যটুকু বোঝার পরেও খুব কম লোকই নড়েচড়ে বসছেন। 'বহু পুতে বাপ নির্বংশ' হওয়ার মত ঘটনাই ঘটে চলেছে ভাষা আন্দোলনের সঠিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে। এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

৩.

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এতদিন কেন যে লেখা হল না, তা নতুন প্রজন্মের মনে বিরাট একটি প্রশ্ন। ইতিহাস যা আছে, তা মৌখিক ইতিহাস। মৌখিক ইতিহাসে নানা বিভ্রান্তি থাকে। সেই বিভ্রান্তি থেকে ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকারকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলকে নিতে হবে।

ভাষা আন্দোলন ৬১ ছাড়াও ১৯৭২ এবং ১৯৮৬ সালেও হয়েছে। কিন্তু বরাকে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি অথবা ইতিহাস বলতে প্রথমেই সেই ঐতিহাসিক ৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের দিকেই সবার মন ছুটে যায়। ঐ ভাষা আন্দোলনে এমন এক ইতিহাস লুক্কায়িত আছে, যা সত্যিকার অর্থে তুলে ধরতে পারলে আমাদের সঠিক উত্তরাধিকার সৃষ্টি হবে। এজন্য আমাদের প্রজ্ঞার সঙ্গে গভীর অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে।

বরাকের ইতিহাসে ১৯ শে মে যেমন সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিন, তেমনি ১৯শে জুন (১৯৬১) সবচেয়ে শোকাবহ দিন। সেই ১৯শে জুনের হাইলাকান্দি দাঙ্গার কুৎসিত এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক স্মৃতিকে ভুলতে গিয়ে প্রায় পাঁচ দশক পার হতে চলেছে, কিন্তু এখনও সেই দুঃসহ স্মৃতি আমাদেরে তাড়া করে। ১৯ শে জুন বাংলাভাষার বুকে ছুরিকাঘাত যারা করেছিল, পরবর্তীতে '৭২ এবং '৮৬ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমরাও মনের জোরে ১৯শে জুনকে অতিক্রম করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে আবুল হোসেন মজুমদার তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন —'বিভেদের রাজনীতিই ১৯৬১ সালের এই দাঙ্গার হোতা। এই ক্রীড়নক যারা হয়েছিলেন, আজ তারা বাতিল। যাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করেছিলেন, তাদের এক কানাকড়ি লাভ তারা করেননি। বরং ক্ষতিই করেছেন সমূহ। যে ভাষার

নামে তারা এটা করেছিলেন, সে ভাষাও কিছু পায়নি। ১৯৮৯ সালে দেখেছি,অসম সাহিত্য সভার হাইলাকান্দি অধিবেশনের সময় সরকারি চাপটাই ছিল এর তথাকথিত সাফল্যের কারণ। সঠিকভাবে জনসাধারণ এর প্রতি নীরব প্রত্যাখান নীতিই গ্রহণ করেছে। নতুন প্রজন্ম যথেষ্ট অগ্রসর এবং সচেতন। তারাও নানা কারণে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু তারা চায় বাঙালি পরিচয় নিয়েই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা লাভ করতে।' (সাপ্তাহিক পরখ, শিলচর ৩০ মে ১৯৯৫)।

৪.

ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার কোন পথে? এই প্রশ্ন করা হলে নানাজনের নানা মত পাওয়া যাবে। যেহেতু আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস লেখা হয়নি, তাই আন্দোলনের কথা নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছায়নি। ভাষা আন্দোলনের কাহিনী আজ তাদের কাছে কল্পকথার সামিল। সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের কাছে অস্পষ্ট। শহিদ স্মৃতির ফলকগুলো দেখে তাদেরও মনে স্বাভাবিক নিয়মে যে উত্তরাধিকার সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। লিখিত ইতিহাস প্রকাশিত হলে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরাধিকার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অথচ মানুষের জানার কী আগ্রহ। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত মৌলিক রচনা কোন কিছু যে কোন পত্রিকায় বের হলেই জানাজানি হয়ে যায়। মানুষ অনেক খোঁজ-খবর নিয়েও তা পড়ে।

ভাষা আন্দোলনের প্রধান উত্তরাধিকার হল সেই ভাষাকে প্রাণের ভাষা হিসেবে আঁকড়ে থাকা। ইংরেজি মাধ্যমে প্রাথমিক স্তর থেকে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটছে, তা নিশ্চিতভাবে আন্দোলনের সুস্থ উত্তরাধিকারের পরিপন্থী। শিশুকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো একটা ভ্রান্তিবিলাস, এ সম্পর্কে মানুষ ক্রমেই সচেতন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি করে হবে। মাতৃভাষা বাংলাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের একটি সঠিক ও স্থায়ী উত্তরাধিকার সৃষ্টি হবে। এই বিষয়টি একদিনে হবার নয়। বিশেষত ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে অনেক অনেক বছর লাগবে। তবে কিছু লোকও যদি এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেন, তবে একদিন সেই উদ্দেশ্য সফল হবে।

পশ্চিমবঙ্গের একজন মনীষী একবার বলেছিলেন— 'যারা বলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়ানো যায় না, তারা হয়তো বাংলা ভাষা জানেন না, নতুবা বিজ্ঞান বুঝেন না।' এই ধরনের আত্মপ্রত্যয়ই হোক আমাদের ভবিষ্যৎ পাথেয়।

৫.

ভাষা আন্দোলনের আরও একটি সুদূরপ্রসারী উত্তরাধিকার হবে নিজেদের বাঙালি সত্তা সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে আত্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। আমরা যে বাঙালি, এই বোধটুকু সর্বব্যাপী করে তোলা। বাঙালি একটি আত্মপরিচয়ের সত্তা হিসেবে কত প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, তা কেউ বলতে পারে না। আবহমান কাল থেকেই এই সত্তা বিরাজমান।

বঙ্গের সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত, তাই বাঙাল অথবা বাঙালি। অন্যান্য জাতীয়সত্তা যেভাবে মূলত একটি ভৌগোলিক পরিচয় থেকে শুরু হয়, বাঙালিও (অথবা বাঙাল) সেই রকম একটি ভৌগোলিক পরিচয় থেকে শুরু হয়েছে। বঙ্গে যারাই প্রব্রজন করে এসেছেন, তারাও কালক্রমে বাঙালি হয়ে গেছেন। কনৌজের ব্রাহ্মণ কিংবা আফগানিস্তান

সহ অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশের 'খান' সৈয়দ ও অন্যান্য বংশস্রোতের লোকও বাংলার আলো-হাওয়া-রৌদ্রের স্পর্শে ক্রমেই বাঙালি হয়ে গেছেন। অন্য কোন পরিচয় কিংবা সত্তা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। বাংলার প্রকৃতি তাদের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাঙালি (কিংবা বাঙাল) রূপে গড়ে দিয়েছে। 'বাঙালি'এবং 'বাঙালের' ব্যাকরণগত পার্থক্য উপলব্ধি করার সাধ্য এই নিবন্ধকারের একেবারেই নেই।

হাজারো হাজার বছরের বাঙালিসত্তা ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ, বর্ণবাদ, ধর্মান্তকরণ, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির চোরাবালিতে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, এই তত্ত্বটি স্বীকার করে নিয়েও প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে বাঙালি সত্তার ঐতিহাসিক জয়যাত্রা কিন্তু থেমে যায়নি। ক্রমাগত সামনের দিকেই এগিয়ে চলেছে এবং আজকের এই চলমান দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা আন্তর্জাতিকতার স্তরে গিয়েও তার মৌলিক সত্তা হারায়নি, বরং জোরদার হয়েছে।

এই বাঙালি সত্তা সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এমন একটি সত্যি কথা বলেছিলেন, যার অনুরণন ছিল সুদূরপ্রসারী। ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী দিবসে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন— "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটা কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায়ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।' (সূত্র ঃ বশীর আল, হেলাল সম্পাদিত 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', পৃঃ ৫৮৭)

ডঃ শহীদুল্লাহর সেই ঐতিহাসিক উক্তি নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 'আজাদ' সহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় জোর বাদ-প্রতিবাদ ও বিতর্ক হয়েছিল। পণ্ডিত প্রবর ডঃ শহীদুল্লাহর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বিশাল রচনার মধ্যে অনেক স্ববিরোধ থাকলেও এই খাঁটি একটি সত্য কথায় কোনরূপ স্ববিরোধ ছিল না। অত্যন্ত সহজ-সরল একটি বক্তব্য, যা থেকে ঐ সময়ের বিদ্বৎসমাজে একথাই প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে যার সারমর্ম হচ্ছে বাঙালিত্বের সঙ্গে অন্য যা কিছুর মতাদর্শগত সংঘর্ষ হবে, পরিণামে বাকি সবকিছুই পরাজিত হবে, জয় হবে বাঙালিত্বের অর্থাৎ বাঙালি সত্তার। ঐ ঐতিহাসিক উক্তিতে 'মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে' এখানে 'মা প্রকৃতি' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ আবহমানকালের বাঙালি মননের পরিচয় বহন করছে। তিনি সমগ্র সত্তা ও মননে বাঙালি হয়েই এরূপ উক্তি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রবহমান সংস্কৃতিক স্রোতই আজ প্রমাণ করছে যে ডঃ শহীদুল্লাহ এব্যাপারে দারুণ সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। তবু মাঝে মাঝে বিভ্রান্তি আসে। আর সেইসব বিভ্রান্তিকে দূর করার জন্য ঢাকার বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত অনেক গ্রন্থের শুরুতে লেখা থাকে— 'একুশ আমাদের পরিচয়'। বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার এ এক দৃপ্ত ঘোষণা, সচেতন প্রয়াস।

৬.

নিজের আত্মপরিচয় নিয়ে নানাজনের মনে নানাভাবে প্রশ্ন আসে। পরিচয়ের প্রশ্ন কবি শঙ্খ ঘোষকেও নানা সমস্যার সম্মুখীন করে তোলে— তাই তিনি তাঁর কবিতায় জিজ্ঞাসা করেন —

'কি আমার পরিচয় মা?'

বরাক উপত্যকায় এই সত্তার দ্বন্দ্ব আমাদের অগ্রগতির রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। নিজের ভিতরে সত্তার দ্বান্দ্বিক আঘাতে নিজেদের 'সত্তাহীন' বলে ঘোষণা করা যায় কি না, তা নিয়েও হয়ত অনেকে মনে মনে ভেবেছেন। কিন্তু বাস্তবে নিজেদের সত্তাহীন বলে ঘোষণা করা সম্ভব নয় বুঝেই নানা সত্তার তুলনামূলক বিচারে মধ্যরাত্রি অবধি

তর্কবিতর্ক চালিয়ে যান অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে আধা যোগী -আধা গেরস্থরা। এধরনের লোকের কাছে সত্তার সঠিক পরিচয় ধরা পড়ে না। শতাব্দী কেটে যায় কী নিদারুণ ভ্রান্তিবিলাসে।

তবুও আমরা ঘুরেফিরে চলে আসি ভাষা সংগ্রামের উত্তরাধিকারের বিতর্কে। আর এই মানসিক দ্বন্দ্ব দূর করার জন্যই বরাক উপত্যকায় ভাষা আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা খুব বেশি করেই অনুভূত হচ্ছে। আজ অনেকেই বলতে শুরু করেছেন— 'আমাদের অমুক ব্যাপারে যে আন্দোলন করা প্রয়োজন, তা ভাষা আন্দোলনের মতই সর্বব্যাপী হবে। এবারের অমুক ব্যাপারে গণজাগরণ আমাদের ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।' এই যে অমুক ব্যাপারে তমুক উদ্দেশ্যে ভাষা আন্দোলনের উদাহরণ দেওয়ার মধ্য দিয়েই ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা কিন্তু সবার নজরে চলে আসছে। তবে যে কোন ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন জড়িত। যারা ভাষা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা কেবল ভাষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নয়, বরং ঐ সঙ্গে তাঁদের সার্বিক অস্তিত্বও সত্তা টিকিয়ে রাখার জন্যই ঐ ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন করেছিলেন। ভাষিক চেতনার সঙ্গে আমাদের সত্তার চেতনা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও উত্তরাধিকার নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব বেশি চিন্তাচর্চা এখনও শুরু হয়নি। তবে এই চেতনাকে যথাযথ লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বরাক উপত্যকার কয়েকজন লেখক এবং কিছু সংস্থা যে আন্তরিক প্রয়াস শুরু করেছেন, সেই সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধকারের 'ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রভাব' নিবন্ধে (যা দৈনিক যুগশঙ্খে ৭,৮ এবং ৯ অক্টোবর ১৯৯৬ তিন কিস্তিতে প্রকাশিত) সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। আবার তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। পরিশেষে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে ধর্মীয় কিংবা অন্য কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে চেতনার গভীরস্তরে নিজেদের বাঙালি সত্তাকে আবিষ্কার করার মধ্য দিয়েই ভাষা আন্দোলনের সত্যিকারের উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হবে। বারে বারে আমাদেরে ভাষা আন্দোলনের চেতনার কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেদিন সমস্ত রাষ্টযন্ত্র তার সকল শক্তি নিয়ে লড়েও ভাষা সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। এক অস্বাভাবিক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লড়েও মাতৃভাষার অধিকার অর্জন করতে উপত্যকাবাসী সক্ষম হয়েছিল, এই জয় প্রসূত আত্মবিশ্বাসই হোক আমাদের ভবিষ্যৎ চলার পাথেয়। আর শহিদ স্মৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী অমর হোক। ◆

মেহরোত্রা কমিশনে সাক্ষীদের বয়ান

অরিজিৎ চৌধুরী

ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ এলেই একষট্টির ১৯ মে শিলচর রেলস্টেশনে পুলিশি গুলিবর্ষণের ঘটনা নিয়ে আসাম সরকার গঠিত মেহরোত্রা কমিশনের প্রতিবেদনের কথা উঠে। সরকার নিজের অপকর্ম ঢাকতেই ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। কিন্তু সত্যকে কী ঢেকে রাখা যায়? সেদিন কমিশনের সামনে সাক্ষীদের বয়ানে বেরিয়ে এসেছিল আসল তথ্য, যা মেনে নিয়েছিলেন কমিশন প্রধান। পুরোনো কাগজ ঘেঁটে সেই তথ্যগুলোকে এখানে সূত্রাকারে তুলে ধরেছেন লেখক।

শিলচর রেলস্টেশনে ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিনে অর্থাৎ উনিশ শো একষট্টি সালের উনিশে মে পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন মহিলা সহ এগারোজন নিহত হন। এই একাদশ শহিদেরা হচ্ছেন : (১) কমলা ভট্টাচার্য, (২) চন্ডীচরণ সূত্রধর, (৩) কুমুদরঞ্জন দাস, (৪) কানাইলাল নিয়োগী, (৫) সুনীল সরকার, (৬) তরণীচন্দ্র দেবনাথ, (৭) শচীন্দ্র পাল, (৮) সুকোমল পুরকায়স্থ, (৯) হিতেশ বিশ্বাস, (১০) সত্যেন্দ্র দেব ও (১১) বীরেন্দ্র সূত্রধর।

এই গুলিচালনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য আসাম সরকার আসামের প্রধান বিচারপতি গোপালজি মেহরোত্রাকে নিয়ে একটি তদন্ত আয়োগ (কমিশন) গঠন করেন। এই আয়োগই মেহরোত্রা কমিশন নামে খ্যাত। কমিশনটি এক সদস্য বিশিষ্ট ছিল।

করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক যুগশক্তি পত্রিকায় ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালের ফাইলে এই কমিশনের শুনানির তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ রয়েছে। উল্লেখ্য ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামী বিধুভূষণ চৌধুরী (১৯০৭-১৯৭৫) ছিলেন যুগশক্তি পত্রিকার সম্পাদক। ফাইল দুটি কীটদষ্ট, তবে মূল তথ্যগুলি সন্নিবিষ্ট করার কাজে তাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

মেহরোত্রা কমিশন কাজ শুরু করে ১৯৬১ সালের ২৬ জুলাই। শিলচর জেলা বারলাইব্রেরি হলে কমিশনের প্রাথমিক অধিবেশনে জানানো হয় যে কমিশনের কাছে স্মারকলিপি পেশের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট এবং সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ করার তারিখ ২৮ আগস্ট। গুয়াহাটির জুনিয়র সরকারি কৌসুলি (counsel) এম সি পাঠক জানান

যে সাক্ষীর সংখ্যা ১০৮। এদের মধ্যে ২৮ জন গোপনে এবং ২ জন শিলঙে সাক্ষ্য দিতে চান। শিলচরে নবপ্রতিষ্ঠিত জেলা গ্রন্থাগার ভবনের দ্বিতলে কমিশনের শুনানি শুরু হয় ২৮ আগস্ট। যে সব সংগঠন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দেয়, তাদের মধ্যে ছিল শিলচর নাগরিক সমিতি, শিলচরের প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটি, শিলচর চেম্বার অব কমার্স, শিলচর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন, এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন, কাছাড় ভারতীয় জনসংঘের শিলচর শাখা, কাছাড় বণিক সমিতি, করিমগঞ্জ নাগরিক সমিতি, করিমগঞ্জ জেলা প্রজা সমাজতন্ত্রী দল (পি এস পি), করিমগঞ্জ মহিলা সমিতি, করিমগঞ্জ জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন ও মোক্তার বার, কাছাড় কমিউনিস্ট পার্টি ও হাইলাকান্দি করদাতা সমিতি। সরকারি কৌসুলি হিসেবে ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগেশ্বর প্রসাদ, তিন অ্যাডভোকেট সুরেন্দ্র প্রসাদ, এম সি পাঠক ও নুরুল হোসেন মজুমদার। জনসাধারণের পক্ষে কৌসুলি হিসেবে ছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায় বার-অ্যাট-ল (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) ও তাঁর পত্নী মায়া রায় বার-অ্যাট-ল, সমর সেন বার-অ্যাট-ল, সব্যসাচী মুখার্জি বার -অ্যাট-ল, অ্যাডভোকেট কাশীকান্ত মৈত্র। স্থানীয় কয়েকজন আইনজীবী দিনরাত খেটে তাঁদের সহায়তা করেন।

সরকার পক্ষের স্মারকলিপিটি ছিল ৩৬ পৃষ্ঠার। তাঁদের মূল বক্তব্য 'শিলচরে গুলিবর্ষণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।'

আসাম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গোপালজি মেহরোত্রা ওই সময় করিমগঞ্জে সফর করেন। তিনি করিমগঞ্জ রেলস্টেশন, কুশিয়ারা নদী, ভাঙ্গা ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন।

সরকারি স্মারকলিপির বক্তব্য যাই থাক না কেন, শিলচরে গুলিবর্ষণের যে কোনো প্রয়োজন ছিল না, বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী বা আধিকারিকদের সাক্ষ্য থেকে তার স্পষ্ট আভাস মেলে। কাছাড়ের তৎকালীন জেলাশাসক বি দোয়ারা তাঁর সাক্ষ্যে জানান যে রেলস্টেশন থেকে গুলিবর্ষণের শব্দে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি যে সময় রেলস্টেশন ত্যাগ করে যান, সে সময় অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। সরকার পক্ষে কৌসুলি নাগেশ্বর প্রসাদ জেরা করার সময় দোয়ারাকে (দোয়ারা উনিশে মে কাছাড়ের উপায়ুক্ত ছিলেন, তবে সাক্ষ্যদানের সময় তিনি (প্রাক্তন উপায়ুক্ত) জিজ্ঞেস করেন আন্দোলনকারীরা কাছাড়কে একটি পৃথক প্রশাসনিক ইউনিটে রূপান্তরিত করার কোনো প্রস্তাব করেছিলেন কি না। নাগরিক সমিতির কৌসুলি ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশংকর রায় তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নে আপত্তি জানান। সাক্ষী অবশ্য বলেন যে একটি যুব সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। দোয়ারা উনিশে মে সকালে পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ও লাঠিচালনার উল্লেখ করে বলেন, জনতা শান্ত হবার পর তাঁদের ওই স্থানেই থাকতে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি এবং ডি আই জি (লালা বি কে দে) সার্কিট হাউসে যান। বিকেল চারটে পর্যন্ত হরতাল চলতে দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। বেলা আড়াইটা নাগাদ তিনি গুলিবর্ষণের আওয়াজ শুনতে পান এবং স্টেশনে এসে দেখেন 'স্টেশনের কাছে রাস্তার মোড়ে জনতা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।' তিনি ডি আই জি'র সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে জানতে পারেন যে ডি আই জি'র অনুমতি নিয়ে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। ব্যারিস্টার রায়ের জেরার উত্তরে দোয়ারা জানান উনিশে মে শিলচরে সতেরো রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল, কিন্তু গুলিবর্ষণের ফলে ক'জন আহত হয়েছিল তা তিনি জানতেন না।

কাছাড়ের পুলিশ সুপার অতুলচন্দ্র দত্ত শুনানির সময় কমিশনকে জানান পুলিশের গুলিবর্ষণের সময় তিনি স্টেশনের ঠিক বাইরে ছিলেন। ইনি পূর্বে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে রেলস্টেশনে প্রস্তর নিক্ষেপের ফলে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী আহত হয়েছেন। সত্যাগ্রহী ও রেলস্টেশনের আবৃত এলাকার মধ্যে দূরত্ব কত জিজ্ঞেস করা হলে

দত্ত বলেন সত্তর ফুটের বেশি হবে না। সিদ্ধার্থশংকর রায় তখন এস পি দত্তকে বলেন, আপনার কাছে এটা শোনার পর আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম। এই ডালডার যুগে কোনো কৃতী ক্রিকেট বোলার ছাড়া আর কেউ যে এত দূরে ঢিল ছুঁড়তে পারবে না, এটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কারণ এই দূরত্ব প্রায় দুশো ফুট হবে। সিদ্ধার্থবাবু কমিশনকে বলেন, সাক্ষী যে দূরত্বকে সত্তর ফুট বলছেন সেটা প্রকৃতপক্ষে দুশো ফুট। স্টেশনে যাওয়ার সম্পর্কেও দত্ত অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। জেরার উত্তরে দত্ত জানান শিলচর রেলস্টেশনে উনিশে মে সকাল ছ'টায় দুই সেকশন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ, সাতটা বিশ মিনিটে এক সেকশন বি এস এফ, আটটায় দুই সেকশন আসাম রাইফেলস এবং তারপর দুই প্ল্যাটুন মাদ্রাজ রেজিমেন্ট মোতায়েন করা হয়। পুলিশ সুপার স্বীকার করেন যে প্রথম পর্যায়ের গুলিচালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগের পর স্টেশনে পৌনে আটটা থেকে শান্তি বিরাজ করছিল। দুপুর সাড়ে বারোটায় তিনি স্টেশন ত্যাগ করেন। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে দত্ত এও স্বীকার করেন যে আইজিপির নিকট প্রেরিত রিপোর্টে মুসলমান এবং মণিপুরিরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রায় সব সাক্ষীই (যাঁদের বেশিরভাগই সরকারি কর্মচারী) কমিশনকে জানান কাছাড়ের (অবিভক্ত কাছাড়) গ্রামাঞ্চলে হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয় এবং কোনো জায়গায়ই লাঠিচার্জের প্রয়োজন হয়নি।

১৯৬১ সালের ২ সেপ্টেম্বর শিলচরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এইচ মজুমদার ও দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বি ভূইয়া কমশিনের সামনে সাক্ষ্যদানকালে স্বীকার করেন যে ইতস্তত প্রস্তর নিক্ষেপ ও কয়েকজন গ্রেফতার করার ঘটনা ছাড়া সকালের লাঠিচালনার পর স্টেশনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। ভূইয়া কমিশনকে জানান সকালের লাঠিচালনা ও গ্রেফতার সম্পর্কে চুক্তি হবার পর সত্যাগ্রহীদের পুলিশ কর্ডনের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে দেওয়া হয়। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মজুমদার সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলেন একজন সাধারণ রিজার্ভ পুলিশের কাছ থেকে একটি রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশসুপার জানান। কিন্তু এ সম্পর্কে সিআরপি'র কাছ থেকে তিনি অভিযোগ পাননি। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের প্রশ্নের জবাবে মজুমদার বলেন যে স্টেশনে গুলিচালনার খবর পেয়ে তিনি মর্মাহত ও চমকিত হন। তিনি যখন স্টেশন ত্যাগ করেন তখন সবকিছু শান্তিপূর্ণ ছিল বলে তিনি জানান। মজুমদার কমিশনকে জানান রাইফেল ছিনিয়ে নেবার সংবাদ পাবার পর সেটি উদ্ধারের জন্য তিনি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। স্পষ্টতই এটা ছিল একটা সাজানো অভিযোগ।

মজুমদার আরও বলেন, তিনি প্ল্যাট ফর্মে পাথরের স্তূপ জমে আছে বলে দেখতে পান। সিদ্ধার্থবাবু তখন তাঁকে একটি ফটো দেখান। এটা দেখে মজুমদার বলেন তিনি প্ল্যাটফর্মে বাড়ি তৈরির জিনিসপত্রের স্তূপ দেখতে পান। তবে ওইগুলি পাথরও ইটপাটকেলের স্তূপ কিনা তা তিনি সঠিক করে বলতে পারেন না। সিদ্ধার্থশংকর রায় তখন মন্তব্য করেন যে অনেকদিন ধরেই প্ল্যাটফর্মের উপরে বাড়ি তৈরির জিনিসপত্রগুলি পড়ে ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট ভূইয়া তাঁর সাক্ষ্যে স্টেশনের এক শান্তিপূর্ণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কেউ কেউ কলা ও লজেন্স কিনছিলেন, এমনকি কেউ কেউ স্টেশনে ঘুমোচ্ছিলেন। সত্যাগ্রহী ও অন্য লোকেরা জল নিয়ে আসছিলেন। ভূইয়া জানান তিনি বেলা দেড়টায় স্টেশনে আসেন। সেখানে তিনি একটি ট্রাকে অগ্নিসংযোগের কথা শুনতে পান এবং বাইরে এসে দেখেন জনসাধারণ ওই ট্রাকে জল ও কাদা ছুঁড়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। এইসব যখন চলছিল তখন দমকল বাহিনীর লোকেরা এসে উপস্থিত হয়। তিনি তখন স্টেশনে এসে সহকারি স্টেশনমাস্টারের কক্ষে যান এবং সেখানে সহকারি এঃ সার্জেন ডাঃ এন জি নাথকে দেখতে পান। কেউ আহত হলে তাঁকে চিকিৎসা করার জন্য ডাঃ নাথ সেখানে ছিলেন। ভূইয়া আরও বলেন যে তিনি দেখতে পান স্টেশনের বাইরে পি ডব্লিউ ডি রোডের উপর আসাম রাইফেলস্-এর লোকেরা রাইফেল নিয়ে এক বিরাট

জনতাকে তাড়া করে যাচ্ছে। এক প্রশ্নের উত্তরে ম্যাজিস্ট্রেট ভূইয়া জানান তিনি জনতাকে কোনোরকম হিংসাত্মক কাজ করতে দেখেননি এবং জনতা কোনো পাল্টা আক্রমণ করেনি। ওই সময় তিনি স্টেশনের দিক থেকে গোলমাল শুনতে পান এবং দৌড়ে সহকারি স্টেশন মাস্টারের কক্ষে যান। সেখানে বসে তিনি গুলির শব্দ শুনতে পান। ভূইয়া আরও বলেন গুলিচালনার পর লেফটেন্যান্ট চাওলা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে এবং ডিআইজি গুলিচালানোর অনুমতি দিয়েছেন। চাওলা ভূইয়াকে একটি কাগজে সই করতে বলেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। ভূইয়া বলেন তিনি একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট যিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়,'ডি আই জি-র অনুমতিতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গুলিচালনা করা হয়েছে, এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি আপনি কি ডেপুটি কমিশনারকে জানিয়ে ছিলেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।' তখন জেলাশাসকের কাছে ভূইয়া প্রদত্ত রিপোর্ট তাঁকে দেখানো হয়। ভূইয়া সেটা পড়ে দেখার পর বলেন কে গুলিচালনা করেছে এবং কেন সে সম্পর্কে এই রিপোর্টে কিছু নেই। ভূইয়া বলেন চাওলার সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো লিখিত বা মৌখিক রিপোর্ট তিনি জেলাশাসককে দেননি।

শুনানির সময় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মজুমদার বলেন স্টেশনে গ্রেফতারে বাধার সৃষ্টি হওয়ায়, তিনি লাঠিচালনার আদেশ দেন। তিনি বলেন, 'বেলা একটার সময় আমি যখন স্টেশন ত্যাগ করি, তখন অবস্থা মোটামুটি শান্ত ছিল।'

৪ সেপ্টেম্বর ট্রেনের ড্রাইবার ডি সি দেব তাঁর সাক্ষ্যে বলেন উনিশে মে শিলচরে পুলিশ কোনোরকম সতর্কতামূলক নির্দেশ না দিয়ে গুলি চালিয়েছিল। রুদ্ধদ্বার কক্ষে তিনি সাক্ষ্য দেন। উনিশে মে ভোর পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে যে ট্রেনটি ছাড়ার কথা ছিল, দেব সেই ট্রেনের ড্রাইভার ছিলেন। প্রেস রিপোর্টারদের শুনানির সময় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

৬ সেপ্টেম্বর শিলচর দমকল বাহিনীর অফিসার আর চক্রবর্তী বলেন একটি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে টেলিফোন যোগে এই সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে যান এবং দেখেন আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য জনসাধারণ ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছেন। অগ্নি সম্পূর্ণভাবে নেভানোর ব্যাপারে তিনি সাহায্য করেন। তিনি কমিশনকে জানান জনসাধারণ ট্রাকটিকে ঘিরে নীরবে ও শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়েছিল।

১২ সেপ্টেম্বর শিলচর রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার জি বি ধর তাঁর সাক্ষ্যে জানান বেলা দুটোয় তিনি শুনতে পান পি ডব্লিউ ডি রোডের নিকটে একটি ট্রাকে আগুন লেগেছে। তখন তিনি পুলিশকে লাঠি ও অস্ত্র নিয়ে জনসাধারণেরপশ্চাদ্ধাবন করতে দেখেন। এরপর তিনি গুলির শব্দ শুনতে পান। এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী অভিযোগ করেন যে সরকার পক্ষের কৌসুলি তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন সরকারের সমর্থনে সাক্ষ্য না দিলে তাঁর পদচ্যুতির জন্য কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করা হবে।

শিলচরের কাছাড় কলেজের অধ্যক্ষ জে কে চৌধুরী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন তিনি জানতে পেরেছিলেন গুলিবর্ষণের সময় স্টেশনের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল।

১৩ সেপ্টেম্বর শিলচরের মহকুমা মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এম এন দাশ বলেন যে তিনি এগারোটি মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেছেন এবং ১৯ ও ২০ মে আরও চল্লিশজন আহতব্যক্তির চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি জনমতের চাপে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। সরকার পক্ষের কৌসুলি নাগেশ্বর প্রসাদ এবং নাগরিক সমিতির কৌসুলি কাশীকান্ত মৈত্র উভয়েই তাকে তীব্রভাবে জেরা করেন। শিলচর রেলস্টেশনের সহকারি স্টেশনমাস্টার এস এন মুখার্জিও তার সাক্ষ্যে বলেন গুলিচালনার আগে তিনি সত্যাগ্রহীদের রেলপথের উপর বসে থাকতে দেখেছিলেন। বেলা দুটোর সময় তাঁর কক্ষে একজন পুলিশ অফিসার বসেছিলেন। পরে

আরেকজন পুলিশ অফিসার সেখানে আসেন। দ্বিতীয় অফিসার ফোনে কাউকে জানান যে একটি ট্রাকে আগুন দেওয়া হয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরই পুলিশের ডিআইজি সেখানে লোকজন সহ উপস্থিত হন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'চার্জ, চার্জ' ও পরে 'ফায়ার' শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ কারা করেছিল তিনি তা বলতে পারেন না। তিনি পুলিশকে প্ল্যাটফর্মের উপর লাঠিচালনা করতেও দেখেছিলেন বলে জানান। কমিশনের শুনানি এরপর ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়।

১৯৬১ সালের ২৭ নভেম্বর আসাম রাইফেলস্-এর অফিসার কমান্ডিং ক্যাপ্টেন এন এস সুমরা এবং কাটিগড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর নলিনী শর্মা মেহরোত্রা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেন। জনসাধারণের পক্ষে ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশংকর রায় ক্যাপ্টেন সুমরাকে জেরা করেন। জেরার উত্তরে সুমরা বলেন তিনি ওইদিন বেলা এগারোটার পরে যখন স্টেশন ত্যাগ করে চলে যান, তখন তিনি এই ধারণা নিয়েই গিয়েছিলেন যে সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি জানান, মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বেলা সাড়ে বারোটায় মাদ্রাজ রেজিমেন্ট এক ঘণ্টার জন্য আসাম রাইফেলস বাহিনীর লোকদের কর্তব্য পালন থেকে অব্যাহতি দেয় এবং আসাম রাইফেলস বাহিনী বেলা দেড়টায় কর্তব্য পালনের জন্য সমবেত হয়। পরিস্থিতি তখন এতটা শান্ত ছিল যে বেলা দেড়টায় তিনি তাঁর বাহিনীর পুলিশদের স্টেশনে রেখে সার্কিট হাউসে চলে যান। তিনি স্টেশনে গিয়ে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁর সাক্ষ্যে সুমরা আরও বলেন যে জনতার প্রস্তর নিক্ষেপের ফলে তিনি এবং তাঁর বাহিনীর সৈনিকেরা আহত হন। তাঁর নিজের আঘাত গুরুতর না হলেও আসাম রাইফেলসের চিত্রবাহাদুর গুরুতর রূপে আহত হন। তবে তিনি বলেন চিত্রবাহাদুর কিভাবে আহত হন তা তিনি দেখেননি। তিনি বলেন প্রজ্বলিত লরির চারদিকে যে জনতা সমবেত হয়েছিল তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের ডি আই জি তাকে বলেছিলেন। সুমরা বলেন কিছুটা বেত্রচালনার পর জনতা রেলস্টেশনের দিকে যেতে থাকে এবং প্রস্তর বর্ষণ করে, পাঁচ-ছয় মিনিট পর তিনি গুলিচালনার শব্দ শুনতে পান। তিনবার তিনি গুলির শব্দ শোনেন। দেড় মিনিটের মধ্যে গুলিবর্ষণ শেষ হয় বলে সুমরা মনে করেন।

কাটিগড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর শর্মা তাঁর সাক্ষ্যে বলেন থানার দারোগার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি শিলচরে ন'জন বন্দীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য এঁদের গ্রেফতার করা হয়। হাতকড়া দিয়ে একটি ট্রাকে করে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাকে ন'জন পুলিশ ছিলেন। শর্মার বয়ান অনুযায়ী বেলা দুটোয় তারা শিলচর পৌঁছলে জনতা ট্রাক থামিয়ে চালককে টেনে বের করে, বন্দীদের হাতকড়া খুলে দিতে আদেশ দেয়, তাঁকে ছাতিপেটা করে এবং ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। শর্মার মতে জনতা আটক ব্যক্তিদের মুক্ত করে নিয়ে যায় এবং প্রস্তরবর্ষণ করতে থাকে। ক্লিনার ও অন্যান্য পুলিশরা ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়েন। সাক্ষী আত্মরক্ষার জন্য স্টেশনের দিকে দৌড়ে যান। শর্মা জানান পাথর ছোঁড়ার ফলে তিনি আহত হন এবং একজন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেন।

২৯ নভেম্বর কমিশন তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ওইদিন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মেজর বাট্টম সিং জেরার উত্তরে বলেন গুলিচালনার জন্য ডি আই জি'র কাছ থেকে লিখিত নির্দেশ নেবার তাঁর প্রয়োজন ছিল না, কারণ ডি আই জি আগেই লিখিতভাবে বল প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছিলেন। বাট্টম সিং বলেন প্রথমে দুজন লোক দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার গুলি ছোঁড়ার সময় তাঁর কিছু লোক দাঁড়িয়ে এবং কিছু লোক হাঁটু গেড়ে গুলি ছোঁড়ে। তিনি বলেন তাঁর সৈন্যরা প্ল্যাটফর্ম থেকে গুলি ছুঁড়েছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে মাথার উপর অবস্থিত একটি ট্যাংকের রেলিংয়ে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ করার কথা তাঁর মনে আছে কি না। তিনি বলেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। গুলি ছুঁড়লে সেটা যে কোনো স্থানে যেতে

পারে। তিনি যথেচ্ছভাবে গুলিচালনার নির্দেশ দেননি বলে সিং দাবি করেন। যখন কৌসুলি সিদ্ধার্থশংকর রায় স্টেশন এলাকার কোয়ার্টার থেকে প্রাপ্ত একটি বুলেট দেখান, তখন বাট্টম সিং বলেন ওই বুলেটটি যে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ব্যবহার করেছিল, তার কোনো চিহ্ন নেই। তবে তিনি স্বীকার করেন যে এ ধরনের বুলেট সি আর পি ব্যবহার করেছিল। সিং জানান হারানো রাইফেল তল্লাসির কোনো লিখিত দলিল তাঁর কাছে নেই এবং পুকুর থেকে কোনো মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল কি না তা তিনি জানেন না।

সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনীর অধিনায়ক মেজর এ পি ডেনিল তাঁর সাক্ষ্যে বলেন ১৯শে মে গুলিচালনার ঠিক পরেই সীমান্ত পুলিশের ডি আই জি-র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর উপস্থিতিতে গোলাবারুদ পরীক্ষা করে দেখা হয়। তিনি বলেন রিজার্ভ পুলিশ ষোল রাউন্ড এবং জেলা এগজিকিউটিভ বাহিনী এক রাউন্ড গুলি চালায়। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের প্রথম ব্যাটেলিয়নের সেপাই যোধ সিং বলেন যে উনিশে মে সকালে জনতার মধ্য থেকে কেউ কেউ কনস্টেবল গুরবাহাদুরের রাইফেল কেড়ে নিচ্ছে বলে তিনি দেখতে পান। তিনি বলেন যখন তাঁরা হারানো রাইফেলের সন্ধান করে ফিরে আসছিলেন তখন জনতা তাদের ঘিরে ফেলে। ইষ্টক বর্ষণের কথাও তিনি বলেন। যোধ সিং বলেন নিদারুণ প্রহারের ফলে তিনি কপালে, হাতে ও পায়ে আঘাত পান। কিন্তু শরীরের ঠিক কোন কোন স্থানে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন সে বিষয়ে সিং পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে পারেননি।

৩০ নভেম্বর শিলচর পুরসভার চেয়ারম্যান মহীতোষ পুরকায়স্থ কমিশনকে জানান যে গুলিবর্ষণের অব্যবহিত পরই তিনি ৩/৪ জন কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে রেলস্টেশনের দিকে ছুটে যান। ওই সময় সীমান্ত পুলিশের ডি আই জি তাঁকে বলেন যে কার আদেশে এবং কত রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়েছে তা তিনি জানেন না। পরদিন সমতল বিভাগের কমিশনার বি এল সেন তাঁকে বলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট গুলিবর্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু একুশে মে মহীতোষবাবু যখন সার্কিট হাউসে কমিশনার সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন সীমান্তের ডি আই জি এক বিবৃতিতে বলেন যে তাঁর আদেশেই গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল।

পয়লা ডিসেম্বর জেরার উত্তরে মহীতোষবাবু জানান উনিশে মে জনতার ইষ্টক নিক্ষেপের কোনো সংবাদ তিনি পাননি। পুলিশ কনস্টেবলকে প্রহার বা কনস্টেবল-এর রাইফেল ছিনিয়ে নেবার কোনো সংবাদও তিনি পাননি বলে পুরপ্রধান জানান।

ওইদিন শিলচর জেলা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য তাঁর সাক্ষ্যে বলেন পুলিশ গুলিবর্ষণ করে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। গুলিবর্ষণের সময় তিনি নিকটস্থ রেলকোয়াটার্সের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমস্ত গুলিবর্ষণের ঘটনা পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে ঘটে যায়। অচিন্ত্যবাবু বলেন, কয়েকজন নিরস্ত্র পুলিশকে জনতা ঘিরে রেখেছিল এবং তার ফলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছে বলে যা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তিনি বলেন যে, যে রেল কোয়াটার্সে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে এবং উর্ধ্বে অবস্থিত রেল ট্যাঙ্কে বুলেটের চিহ্ন পাওয়া যায়।

১৯৬২ সালের ১২ জানুয়ারি ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ লালা বি কে দে-র সাক্ষ্য নেওয়া হয়। অসুস্থতার জন্য তাঁর শিলংয়ের বাসভবনে তিনি সাক্ষ্য দেন। এক সদস্য বিশিষ্ট মেহরোত্রা কমিশনের সামনে দে বলেন তিনবার গুলিচালনার আদেশ দেবার প্রয়োজন হয়েছিল এবং কেবলমাত্র তৃতীয়বার গুলিচালনার পরই জনতা পলায়ন করতে আরম্ভ করে। ডি আই ডি আরও বলেন যে এ ধরনের সংকল্পবদ্ধ জনতা তিনি কখনও দেখেন নি।

এই সাক্ষ্য গ্রহণের সময় শিলচর নাগরিক সমিতির পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং তাঁর পত্নী ব্যারিস্টার মায়া রায়। সরকার পক্ষে ছিলেন নাগেশ্বর প্রসাদ। সিদ্ধার্থবাবুর এক প্রশ্নের জবাবে দে

বলেন প্রকৃতপক্ষে তিনি গুলিচালনার আদেশ দেন নি, তবে প্রয়োজন হলে গুলিচালনার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থ রায় বলেন, কোনো সরকারি কাগজপত্রেই কে গুলিবর্ষণের আদেশ দিয়েছেন তার উল্লেখ নেই। দে এটা অস্বীকার করে বলেন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন এবং তাতে তিনি বলেছেন গুলিবর্ষণের আদেশ তিনিই দিয়েছেন।

সিদ্ধার্থবাবু বলেন, 'আপনার সাক্ষ্যে আপনি বলেছেন জনতার পিছন দিকে পাঁচজন পুলিশ আটক অবস্থায় ছিল এবং তারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল। আমাদের বিশ্বাস গুলিবর্ষণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে আপনি এই কাহিনিটি রচনা করেছেন।' উত্তরে লালা বি কে বলেন, এই ধারণা ভুল। তখন সিদ্ধার্থবাবু জানতে চান, 'আপনার রিপোর্টে এই কাহিনিটি স্থান পায়নি কেন?' দে বলেন, 'রিপোর্টে এটা নেই।' সিদ্ধার্থশংকর রায় তখন মন্তব্য করেন, 'তাহলে বুঝতে হবে এরকম কিছু ঘটেনি।' তখন দে শুধু বলেন, 'এটা ঠিক নয়।'

সাক্ষীকে এরপর পুকুরে নিখোঁজ রাইফেল সম্পর্কে জেরা করা হয়। সাক্ষী বলেন যে তিনি গোপনসূত্রে সংবাদ পেয়েছিলেন রাইফেলটি পুকুরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর রিপোর্টে এর উল্লেখ করেননি এবং এই খবর যে তিনি পেয়েছিলেন তার সমর্থনে তিনি কোনো প্রমাণও দিতে পারেননি।

মেহরোত্রা কমিশনের শেষ অধিবেশন ১৯৬২ সালের ১৩ মার্চ শিলচরের জেলা গ্রন্থাগার কক্ষে শুরু হয়। এই অধিবেশন চলাকালীন সরকারি কৌসুলি নাগেশ্বর প্রসাদ এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে শিলচরের গুলিবর্ষণ এবং করিমগঞ্জে লাঠিচালনা যুক্তিযুক্ত ছিল। তিনি এই প্রসঙ্গে গুলিবর্ষণ, রেললাইন তুলে ফেলা, পুলিশের প্রতি তথাকথিত আক্রমণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন।

কিন্তু জনসাধারণের পক্ষের কৌসুলি সিদ্ধার্থশংকর রায় সওয়াল করার সময় সুনিপুণভাবে যুক্তিসহ এইসব অভিযোগ খন্ডন করেন। তিনি বলেন, কাছাড়ের মানুষ কোনো বিশেষ অনুগ্রহ চায় না এবং কারোর বিরুদ্ধে তাদের কোনো বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই। তাদের দাবি শুধু কাছাড়ের বাঙালিদের পক্ষের নয়, সমগ্র দেশের সমস্ত ভাষাগত সংখ্যালঘুদের পক্ষের। সিদ্ধার্থবাবু বলেন সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিষদের জন্মের অনেক আগে সশস্ত্রবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন ও আসাম উপদ্রুত এলাকা আইন বলবৎ করা হয়েছিল এবং কোনো কোনো বিশেষ এলাকায় কর্তব্যরত স্থলবাহিনীকে চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র কমিশনড ও নন-কমিশনড অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার ও আসাম রাইফেলস-এর অফিসারদের গুলি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, গুলি করার জন্য অপরকে নির্দেশ দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেন ট্রাক সংক্রান্ত ঘটনাস্থলের অবস্থা ডি আই জি লালা বি কে দে এসে না পৌছানো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণই ছিল এবং এই ডি আই জি-ই সমস্ত হাঙ্গামার মূল কারণ। সিদ্ধার্থবাবু বলেন, দে একজন দক্ষ পুলিশ অফিসার হতে পারেন, তবে তখন তিনি সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি একটি জিপে করে দ্রুত রেলস্টেশনের দিকে যান এবং স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সময় রাস্তা থেকে জনতাকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন সুমরাকে আদেশ দেন। অথচ ক্যাপ্টেন সুমরার মতে এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ট্রাকের আগুনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সিদ্ধার্থশংকর রায় বলেন জনসাধারণ কাদা ও কচুরিপানা দিয়ে আগুন নেভাতে সাহায্য করেন এবং অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট ভুইয়া, ক্যাপ্টেন সুমরা ও ফায়ার ব্রিগেডের অফিসার এটা স্বীকার করেছেন। সিদ্ধার্থবাবু বলেন, ডি আই জি মাথা ঠিক রাখতে পারেননি এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি কাজ করেছিলেন।

সিদ্ধার্থবাবু রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে অসমিয়া ভাষা গৃহীত হবার পর কাছাড়ে ভাষা আন্দোলন সৃষ্টির বিবরণ দেন। তিনি বলেন এই আন্দোলনের জন্যই ভাষা আইন সংশোধিত হয়, নইলে হত না। তিনি কমিশনের নিকট আবেদনে জানিয়ে বলেন যে নিম্নলিখিত কারণে এই গুলিবর্ষণকে অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করা হোক :-

(১) গুলিবর্ষণের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নেওয়া হয়নি, (২) প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল, (৩) কোনো সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজন না থাকায় গুলি করে হত্যা করা সঙ্গত হয়নি, (৪) যাদের গুলিচালনার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেনি।

সিদ্ধার্থবাবু ডিআইজি-কে 'চিনা মাটির বাসনপত্রের দোকানের ষন্ড' বলে অভিহিত করেন। নাগেশ্বর প্রসাদ অবশ্য সিদ্ধার্থবাবুর যুক্তিগুলির উত্তর দেবার সময় ডি আই জি-কে 'সুযোগ্য অফিসার বলে আখ্যায়িত করেন।'

বিচারপতির গোপালজি মেহরোত্রা তাঁর রিপোর্ট ১৯৬২ সালের ১০ এপ্রিল বিকেলে একজন বিশেষ বার্তাবাহক মারফত রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী শিলংয়ে পাঠান। কথা ছিল, কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আসাম মন্ত্রিসভার বৈঠকে রিপোর্টটি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং পরে তা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু ঘটনার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হলেও সে রিপোর্ট আর প্রকাশ পায়নি, যদিও কমিশনের সাক্ষ্যগুলি থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শিলচর রেলস্টেশনে গুলিবর্ষণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অমানবিক ছিল।

আসাম বিধানসভায় বদরপুরের বিধায়ক আনোয়ারুল হক মেহরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে সরকারি তরফ থেকে জানানো হয় যে এটা এখন ইতিহাসের বিষয় (matter of history), সুতরাং এখন এই রিপোর্টটি প্রকাশের প্রশ্ন ওঠে না। উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তীব্র বাঙালি-বিরোধী দাঙ্গা হয়েছিল। ওই সময় গোরেশ্বরে সংঘটিত হাঙ্গামা সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল আসাম সরকার। তদন্ত করেছিলেন এই গোপালজি মেহরোত্রাই। এছাড়া ১৯৬০ সালের ৪ জুলাই গুয়াহাটিতে পুলিশের গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত করেছিলেন গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি সি পি সিংহ। এই দুটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্টই কিন্তু এক বছরের মধ্যে প্রকাশ করেছিল সরকার। প্রকাশ পেল না শুধু মেহরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট। ◆

তথ্যসূত্র :

করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক যুগশক্তি পত্রিকা ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালের ফাইল।

ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : প্রাসঙ্গিক বিষয়

আবুল হোসেন মজুমদার

ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্যেই একদিকে বিভাজনের রাজনীতি, অন্যদিকে আর্থিক দিক থেকে অবরোধ তৈরি করে বরাক উপত্যকাকে এক জটিল সংকটের আবর্তে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে। পরিস্থিতির সতর্ক বিশ্লেষণ করে সমাধানের পথ খুঁজেছেন লেখক।

১.

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি সে জাতির নাম মানুষ জাতি' অথবা 'নানান বরণ গাভী রে তার একই বরণ দুধ/ জগৎ ভ্রমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত' --মানুষকে অন্য সবকিছু থেকে বিযুক্ত করে কেবল মানুষ হিসেবে দেখতে হলে বলবার প্রথম আর শেষকথা এটাই। আর, ভাববাদী ধারণা বলে সমালোচিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও এটাই মানবতার নিরংকুশ আদর্শিক সত্য। তবে বাস্তব জগতে মানব সমাজ নানা বৈচিত্র্যের সমাহার-এথনিসিটি, জাতীয়তা, সংস্কৃতির ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় দিয়ে বিঘোষিত হয়েই মানুষের পরিচয়। এই বিষয়গুলোর কোনো কোনোটি এমন যে, মৌলিকভাবে তার নির্বাচনে মানুষের কোনো হাত নেই, অবশ্য কোনো কোনোটার নির্বাচন মানুষের বিচার বিবেচনা প্রসূত ইচ্ছাধীন, যেমন ধর্ম। তবে তাত্ত্বিকভাবে, কোনোটাই এমন নয়, যার পরিবর্তন সম্ভব নয়। মানুষের এথনিক, ভাষিক, ধর্মীয়, এমনকী জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ও পরিবর্তিত হতে পারে নানা কারণে। আসাম, বাংলা সহ গোটা বিশ্বের অগণিত অঞ্চলের জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার ইতিহাসে পাওয়া যাবে এর প্রমাণ। সাধারণভাবে বলতে গেলে মানুষের গোষ্ঠীগত পরিচয়ের এই নির্ণায়ক চিহ্নগুলো প্রকৃতিজাত, পবিত্র এবং এমনভাবে তাদের আবেগ ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে জড়িত যে, এসবের ওপর কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ অন্যায় ও অশান্তি সৃষ্টির কারণ। আবার এগুলো এমনি প্রকৃতিজাত জিনিস যে, এগুলোর জন্য মানুষের কোনো গর্ব বা গৌরববোধের কোনো যৌক্তিকতা নেই, কেননা মানুষ গর্ব বা গৌরব বোধ

করতে পারে একমাত্র তার অর্জনের জন্য। এ কারণেই কোরআনে বলা হয়েছে, 'হে মানবজাতি আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে ভাগ করেছি নানা গোত্র ও জাতিতে, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। অবশ্যই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ধর্মভীরুরাই'। অর্থাৎ গোত্র, জাতীয়তা ইত্যাদি মানুষের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন মাত্র, গর্ব বা গৌরবের বিষয় কেবল আত্মার উৎকর্ষ। কোরআনের এই আয়াতকে মানুষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূলসূত্র বলে মনে করেন ড° অম্লান দত্ত।

২.

জাতীয়তায় রূপান্তর লাভ মানুষের বিকাশের একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। জনজাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো কোথাও বা কখনো শ্রেণিদ্বন্দ্ব এবং সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতিতে রূপান্তরিত হয়। আবার কোথাও কোথাও বা কখনো কখনো melting together বা দ্রবণ ও সংমিশ্রণ এবং সমীভবনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। প্রাচ্যে তথা ভারতে, এবং বিশেষ করে বঙ্গ ও আসামে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিই কার্যকরী হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, আসাম যখন কামরূপ নামে পরিচিত ছিল তখন থেকেই এখানে নানা জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে আসছেন। ধীরে ধীরে ককেশিয় জনগোষ্ঠীর লোকেরাই তাদের সংস্কৃতির উৎকর্ষের সুবাদে এখানে প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে এবং তাদেরই প্রভাবে অসমিয়া ভাষা ও জাতিগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। অসমিয়া ভাষার শব্দসম্ভারের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তদ্ভব শব্দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তারপরেই স্থানীয় বিভিন্ন জনজাতীর ভাষার শব্দের ভাণ্ডার। অনার্য ভাষায় (ইন্দোমঙ্গোলীয় আদি) শব্দাবলির মধ্যে অস্ট্রিক ভাষা-পরিবার এবং চিন-তিব্বতীয় ভাষা পরিবারের শব্দই প্রধান। বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন না হলেও ড° বাণীকান্ত কাকতি খাসি, কোল, মুন্ডা, সাঁওতাল, মালয় ভাষা এবং চিন-তিব্বতীয় ভাষা পরিবারের তাই ও তিব্বত-বর্মীয় শাখার বড়ো উপশাখার ভাষায় বেশ কিছু শব্দের সাথে অসমিয়া শব্দের মিল দেখিয়েছেন। অনেকগুলো স্থান ও অধিকাংশ নদীর নাম প্রধান প্রধান অনার্য ভাষা থেকে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন ড° কাকতি। এ সমস্ত ভাষার শব্দ বাদ দিলে শুধু আর্যমূল শব্দ নিয়ে অসমিয়া ভাষার টিকে থাকাটা সম্ভব হতো না। বলার কথা হচ্ছে, অসমিয়া জাতি যে বিভিন্ন এথনিক জনগোষ্ঠী ও জনজাতির সংমিশ্রণের বা দ্রবীভবনের ফলশ্রুতি, তা তাদের দৈহিক গঠনে যেমন, তেমনি তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতিতেও সুস্পষ্ট।

১৮২৬ সালে ইয়ান্ডাবুর সন্ধির দ্বারা আসাম ব্রিটিশ অধীনে চলে যায়। ১৮৮১ সালে যে লোকগণনা হয়, তাতে দেখা যায় আসামের মোট জনসংখ্যা ২২,৪৯,১৮৫। ওই সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৮, ৭৫,২৩৩ জন বড়ো-কাছাড়ি। মুসলিমদের সংখ্যা ৯.৩। অর্থাৎ ২,০৮,৪৩১। একমাত্র অব্রাহ্মণ বর্ণহিন্দু অসমিয়া যাদের প্রাথমিক আর্য উপনিবেশ স্থাপনকারী বলা হয়ে থাকে, সেই কলিতাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০.৭ শতাংশ, আর ব্রাহ্মণ ছিলেন মাত্র ৬৮৭৮৪ জন। এই ব্রাহ্মণদেরও আবার অনেকেই ছিলেন বাঙালি। রাজবংশীদের সংখ্যা ছিল ৩,৩৬,৭৩৯।

১৮৭৪ সালে আসামের সঙ্গে কাছাড় জেলা (পুরাতন রাজ্য), গোয়ালপাড়া এবং পূর্ববঙ্গের সিলেট বা শ্রীহট্ট জেলা সংযুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। একমাত্র গোয়ালপাড়া ছাড়া বাকি দুটো জেলাতেই বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। গোয়ালপাড়াতে রাজবংশীদের প্রাধান্য অসমিয়া ভাষার মধ্যেই আরেকটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপভাষার জন্ম দিয়েছিল, যার অবস্থান ছিল বাংলা ও অসমিয়া ভাষার মাঝামাঝি।

১৮২৬ সালের ইংরাজদের প্রশাসনে সহায়তার জন্য অনেক বাঙালিকে আসামে আনা হয়, কারণ অসমিয়া

সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষায় পশ্চাদপদতার দরুণ তখনো একাজের যোগ্য যথেষ্ট লোকের অভাব ছিল। অসমিয়ারাও প্রথম প্রথম আধুনিক শিক্ষালাভ করতেন কলকাতা গিয়ে। বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের তাঁরা তখন মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, মণিরাম বড়বন্দর বরুয়া, যদুরাম বরুয়া প্রমুখ মনীষী বাংলা ভাষায় উপহার দিয়েছেন তাদের অনেক রচনা। যদিও ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আসামের শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা, যা ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরাই প্রচলন করেছিলেন, তবু সে সময় অসমিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। ধীরে ধীরে মিশনারি ও অসমিয়া পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় অসমিয়া ভাষা উপযুক্ত হয়ে উঠলে বাংলাকে সরিয়ে অসমিয়াকেই করা হয় শিক্ষার মাধ্যম। এই সময়েই বঙ্গভাষী শ্রীহট্ট ও কাছাড় আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়। অসমিয়াদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাঙালি-বিদ্বেষ—যাতে ব্রিটিশদের অবদানও ছিল—আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল এই দুটো জেলাকে কেন্দ্র করে।

সাধারণভাবে বাঙালি জাতি আর বিশেষভাবে বাঙালি মুসলমানকে চিহ্নিত করা শুরু হয় অসমিয়ার শত্রু হিসেবে। গত শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকের বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের অন্যতম নেতা অতুল বরা একটি সাক্ষাৎকারে Assam from Agitation to Accord গ্রন্থের লেখক হামিদ নাসিম রফি আবাদিকে বলেছিলেন, 'The Bengali Hindus pose before us economic threat and the Bengali Muslims pose before us political threat.' কিন্তু কোনো threat এর জন্য তো বাঙালিরা আসেননি আসামে। সাধারণভাবে বাঙালি হিন্দুদের আগমনের ইতিহাস উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ওপরে।

বাঙালি মুসলমান বা মৈমনসিঙিয়াদের আসামে আগমনের দুটো কারণ ছিল। এক) পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা বঙ্গদেশে ক্ষমতাবান হয়ে ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য চৌধুরী নিয়োগ প্রথা প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এরফলে পূর্ববঙ্গের ৭০ ভাগ কৃষকের জমি চলে যায় ৩০ ভাগ জমিদারের হাতে। জমিদার শ্রেণির অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আকুল হয়ে ওঠে প্রজারা, যাদের অধিকাংশই ছিল সেইসব মুসলমান, যারা উচ্চবর্ণের হিন্দুর নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদের বঙ্গদেশ থেকে বাইরে প্রব্রজনের জন্য বাধ্য করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মিলিত হয়ে তাদের অবস্থা আরও অসহনীয় করে দেয়। দুই) আহোম রাজত্বের শেষ দিকে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, মানের আক্রমণ, ব্রহ্মযুদ্ধ ইত্যাদি কারণে আসামে বহু লোকক্ষয় হয়। তাছাড়া নতুন ভূমিনীতির ফলে বিপর্যস্ত অনেক কৃষক আসাম ছেড়ে পালাতে শুরু করে। তারপরে আসে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতির প্রকোপ, যাতে আরও অনেক লোকক্ষয় হয়। এদিকে ব্রিটিশদের আনা চা-বাগান শ্রমিক, যাদের সংখ্যা পদ্মনাথ গোহাঞির মতে তৎকালীন আসামের জনসংখ্যার এক - চতুর্থাংশ (প্রায় ৪০ লাখ) হয়ে গিয়েছিল, এবং বাঙালি কর্মচারী - এদের সকলের খাদ্য জোগানের জন্য কৃষির প্রয়োজনে লোকের দরকার ছিল। এই প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে লর্ড জেনকিনস পূর্ববঙ্গ থেকে ওইসব মৈমনসিঙিয়া মুসলিম কৃষকদের ডেকে আনার ব্যবস্থা করেন, এবং তিন বছরের জন্য জমির খাজনা মকুব করে দেন। ১৮৯৭ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই প্রব্রজন চলতে থাকে একনাগাড়ে। ১৯২১ সালে জনগণনা হয়। তখন পর্যন্ত এদের আগমনের ফলে আসামে মুসলিম জনসংখ্যা ৪০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। ধান ও পাট ক্ষেতের মাধ্যমে আসামকে শস্যশ্যামলকারী এইসব দরিদ্র কৃষককে একটি অঞ্চলে জনবিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য ১৯১৬ সালে নগাঁও জেলার লাইন প্রথার প্রবর্তন করা হয়। বাঙালিরা এই প্রথার বিরোধিতা করলেও অসমিয়া হিন্দু-মুসলমান সকলেই এর সপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন একযোগে।

এই সময় পর্যন্ত অসমিয়া বর্ণহিন্দুরা ইংরাজি শিখে সমাজজীবনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে শুরু করলে

তাদের মধ্যে একদিকে প্রবলাকার ধারণ করে বাঙালি বিদ্বেষ, আর অন্যদিকে গড়ে ওঠে মুসলিম বিদ্বেষ— আসামের ইতিহাসে যা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। এ সময়কার সাহিত্যেও অসমিয়াত্ব ও আর্যজাত্যাভিমানকে একত্র করে একটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার জন্ম দেওয়া শুরু হয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেঙ্গল রেনেসাঁর সময় বাংলা সাহিত্যেও এরকম একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

৩.

এখানে এ কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অভিবাসী বাঙালি মুসলমানেরা গোয়ালপাড়া থেকে নগাঁও তথা লক্ষীমপুর পর্যন্ত তাদের স্বতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দুটো দাবি নিয়ে খাড়া হয়েছিলেন— তাদের মুসলমানত্ব আর বাঙালিত্ব - দুটোকেই সংরক্ষণ করতে হবে। এই লড়াইয়ের ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯২১ সালে মক্তব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যে ব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেকটি স্কুলে একজন মৌলবি ও একজন সাধারণ শিক্ষকের নিযুক্তি দেওয়া হত। সাধারণ শিক্ষক বাংলা মাধ্যমে সাধারণ বিষয়গুলো পড়াতেন। কিন্তু অচিরেই অসমিয়াবাদীরা এ প্রথার বিলোপ সাধনের দাবি তোলেন আর তাতে ব্রিটিশ শাসকের সায় মেলে। গোয়ালপাড়ায় প্রথম কার্যকরী করতে শুরু করা হয় মক্তব শিক্ষাব্যবস্থা আর প্রবর্তিত হতে থাকে অসমিয়া মাধ্যমের শিক্ষা। ১৯৩৫-এ বরপেটায় মৌলানা আব্দুল হামিদ ভাসানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় All Parties Bengali Convention। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হলেও রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। অবশ্য নগাঁও- এ আরও কিছুকাল প্রতিরোধ চলেছিল। ড° এম কর তাঁর গবেষণাগ্রন্থ Muslim in Assam Politics- এ লিখেছেন যে, আরও কিছুকাল নগাঁও-এর অভিবাসী বাঙালি মুসলমানরা দুই সেট বই রেখে চালিয়েছেন স্কুল। একসেট অসমিয়া- পরিদর্শকের জন্য, আর একসেট বাংলা শিক্ষার জন্য।

শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পর থেকেই যে অসমিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওপরে। সুরমা উপত্যকা নামে পরিচিত এই অঞ্চলের স্বার্থ হানিকর, তথা অপমানকর কথাবার্তা শুরু হয়। ১৮৮১ সালে স্যার অ্যাডোয়ার্ড গেইট সম্পাদিত আদমসুমারির রিপোর্টেও ১৯০৯ সালের Imperail Gazette — এই অঞ্চলের বাঙালিদের ভাষা ও জাতিগত পরিচয় প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। প্রখ্যাত অসমিয়া পণ্ডিত বেণুধর রাজখোয়া ১৯০৩ সালে Notes on the Sylheti Dialect নামে বই প্রকাশ করে এই সত্য প্রতিপালনে প্রয়াসী হন যে, শ্রীহট্ট-কাছাড়ে প্রচলিত বাংলাভাষা আসলে অসমিয়া ভাষারই উপভাষা মাত্র। এইসব আক্রমণ ও অসত্য প্রচারের প্রতিবাদে এবং সুরমা উপত্যকার বাঙালির আত্মপরিচয়কে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় 'সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনী'। এই সংগঠনের ১৩২৩ বাংলা সনের অধিবেশনের সভাপতি ভুবনমোহন দেববর্মা তাঁর অতি মূল্যবান সুদীর্ঘ তথ্যবহুল অভিভাষণে যেভাবে উগ্রজাতীয়তাবাদী অসমিয়াদের কূটতর্ক সমূহের উত্তর দেন, তা এক ইতিহাস। অভিভাষণটি একাধারে সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞানে ও আত্মপরিচয়ের পক্ষে পেশ করা যুক্তির একটি অমূল্য দলিল। কিন্তু কূটতর্কের অন্ত হয়নি। আগ্রাসনেরও শেষ নেই। ১৯৮৯ সালে হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার অধিবেশনেও নির্লজ্জভাবে উত্থাপন করা হয়েছিল সেইসব পুরাতন বস্তাপচা যুক্তি— বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে ড° সুজিৎ চৌধুরী 'সত্য ও তথ্য' পুস্তিকা লিখে যার জবাব দেন।

যা হোক, দেশভাগ এবং শ্রীহট্টের গণভোটের পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বনাম সুরমা উপত্যকা, অন্যভাবে বলতে গেলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমিয়া নেতৃবৃন্দ বনাম সুরমা উপত্যকার বাঙালি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আসামের

উন্নয়নমূলক অনেকগুলো প্রকল্প নিয়ে টানাপোড়েন চলতেই থাকে। অসমিয়ারা চাইতেন নিজেদের পাতে ঝোল টানতে— মেডিক্যাল কলেজ, হাইকোর্ট ইত্যাদি আসামে প্রতিষ্ঠা করতে, সুরমা উপত্যকার নেতারা এই দুয়েরই বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা বলতেন, কলকাতা হাইকোর্টই তাদের জন্য যথেষ্ট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে আসামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও তারা পক্ষপাতী ছিলেন না। ডিব্রুগড়ে বেরী হোয়াইট মেডিক্যাল স্কুলকে তাঁরা চাইতেন না। তারা চাইতেন সিলেটে আগে মেডিক্যাল কলেজ হোক। অন্যদিকে অসমিয়ারা এমনকী ছাত্রদের বৃত্তিদানের সময়ও বৈষম্য করতেন। এমনকী এও দেখা গেছে যে একজন ছাত্র আসামের বাসিন্দা হয়েও বৃত্তি পায়নি শুধু এ কারণে যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখানে এসেছিল। এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির ফলে অসমিয়ারা মনে করতেন যে, সিলেট আর তার junior partner কাছাড়ের আসাম থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। সুরমা উপত্যকার বাঙালিরাও মোটামুটি এরকমই ভাবতেন যে বঙ্গের সাথে সংযুক্তিই তাঁদের এই অস্বস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। উল্লেখ করা দরকার যে রাজনীতিবিদ্‌রা যাই বলুন, অসমিয়া হিন্দু-মুসলমান কেউই এমনকী সাদুল্লা সাহেবও চাইতেন না যে, বাঙালিরা বাঙালি হিসেবে আসামে থাকুক। ১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহরু যখন আসাম সফরে আসেন তখন আসাম সংরক্ষিণী সভা'র পক্ষ থেকে নীলমণি ফুকন ও অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী তাঁকে স্মারকপত্র দিয়ে দাবি করেছিলেন যে, আসামের অসমিয়া এবং হিন্দু চরিত্র যেন বহাল রাখা হয়। রায়চৌধুরী স্বাধীনতা লাভের প্রাক্-মুহূর্তে বলেছিলেন 'Not only Sylhet but its junior partner Cachar plains also, at any rate Hailakandi sub-division should be given to Pakistan.' বলাবাহুল্য যে গণভোটে শ্রীহট্টের পাকিস্তানভুক্ত হওয়া এই মনোভাবেই ফলশ্রুতি। কাছাড় অর্থাৎ বর্তমান বরাক উপত্যকা, হাইলাকান্দি সহ, আসামে থেকে যাওয়ার দরুণই উগ্র অসমিয়াদের চক্ষুশূল । ১৯৬২ সালের ১৯ মে, ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট, আর ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই সৃষ্টি করেও আমরা স্বস্তিতে নেই।

৪.

কি ভাবে দেশবিভাগের পর গোয়ালপাড়া ও নগাঁও-এর বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোকে রাতারাতি অসমিয়া মাধ্যম করা হল তা এই নিবন্ধে নতুন করে উল্লেখ করার দরকার বা সুযোগ নেই। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিশাল সংখ্যক বাঙালি মুসলমানও যে অসমিয়া হয়ে গেলেন (ন-অসমিয়া) তার সবটাই যে স্বেচ্ছায় নয়, আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য তাদের সুদীর্ঘ সংগ্রামই তার প্রমাণ। তবুও স্বীকার করতেই হয়, এরা অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ না করলে আজকের আসামে অসমিয়াদের অস্তিত্বই বিপন্ন হত। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৩১ সালের সেন্সাস কমিশনার মুল্লান সাহেব অসমিয়াদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন এই বলে যে 'অবস্থা এরকম থাকলে আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে অসমিয়া ভাষাভাষীরা কেবল শিবসাগর জেলায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বেন। কিন্তু পরবর্তী তিরিশ বছর কেন আশি বছরেও তাঁর অনুমান তো সত্য প্রমাণিত হলই না, বরং পরবর্তীকালে অসমিয়া জনসংখ্যার যে হিসাব আমরা পাই, তাই ভাগাইওয়ালার ভাষায়, Biological Miracle ও Assamese Aggrassiveness. ১৯১১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে অসমিয়া জনসংখ্যা বেড়েছে ৯৬৬.৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৮.৩৫ লাখ থেকে হয়েছে ৮৯.০৫ লাখ। আর এই অনুপাতে বাঙালি ও অন্যান্য ভাষাভাষীদের সংখ্যা কমেছে। মুসলিম জনসংখ্যাও অস্বাভাবিকভাবে বাড়েনি। ১৯৭১ এ ছিল ২৪.৫৬। ১৯৯১ তে হয়েছে ৩১ শতাংশ। আবার এই বৃদ্ধিও যে অনুপ্রবেশের ফলে নয়, অন্যান্য নানা কারণে, তা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সেমিনার করে, পত্রপত্রিকায় আলোচনা করে বই নিয়ে নানাভাবে প্রমাণ করেছেন। তবুও বলা হচ্ছে দৈনিক আটশোরও বেশি বাংলাদেশি

ঢুকছে বরাক উপত্যকায়। আগামীতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হবেন কোনো বাংলাদেশি। শুধু আসাম নয়, গোটা দেশ যাবে,পাকিস্তান প্রভাবিত বাংলাদেশ হবে ইত্যাদি। রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন-সব একত্রিত হয়ে ভূমিপত্রের স্বার্থরক্ষার নামে অসমিয়াদের জন্য শতকরা একশোভাগ সংরক্ষণের দাবি উঠেছে। একদিকে এই পরিস্থিতি, অন্যদিকে বরাক উপত্যকাকে সকল ধরনের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম থেকে বঞ্চিত করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখে চাকুরি-নিযুক্তি না দিয়ে রোজি রোজগারের পথ বন্ধ করে দিয়ে ভাতে মারার ব্যবস্থা হচ্ছে। আবার তার পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে লোক এনে নিযুক্তি দেওয়া হচ্ছে এই উপত্যকায়। অসমিয়া সংস্কৃতিকেন্দ্রিক নানা উৎসব, অসমিয়া ভাষায় প্রচারপত্র উপত্যকায় চালানো, সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নাম করে একশ্রেণির বাঙালিকে অসমিয়া ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে পরিণত করা, এমনকী অনেক লড়াইয়ের ফসল আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির পথেও নানা বাধাবিঘ্ন সৃষ্টির ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এগারোটা প্রাণের বিনিময়ে বাংলাভাষা যে সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল বরাক উপত্যকায় তারও সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই এই উপত্যকায়। বরাক ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে সুস্থ ভাববিনিময়, বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে ওঠার মধ্যেই আসামের মঙ্গল। কিন্তু এখানে উল্লেখিত অবস্থায় কী তা সম্ভব? অসমিয়া উগ্রজাতীয়তাবাদ আসামকে পোড়ামাটিতে পরিণত করার পরেও যদি বোধোদয় না হয়, তাহলে কী করা যাবে? সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন অসমিয়া বুদ্ধিজীবী ও সমাজতাত্ত্বিকরা এগিয়ে এলে বরাকও এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। বিশিষ্ট অসমিয়া বুদ্ধিজীবী কনকসেন ডেকা একসময় ছিলেন জাত্যাভিমানী, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনিই লিখলেন 'বিক্ষুব্ধ যুব সমাজ ও অসম' যে বইখানি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আসাম কী ছিল, আর কী হয়েছে; এখন তার বাঁচার পথ কী? কিন্তু দু:খের বিষয় যে, এই গ্রন্থেরই ভূমিকা লেখক ড° এইচ কে বরপূজারী আবার নতুন করে মনগড়া তথ্য দিয়ে অসমিয়া ভাইদের বাঙালি বিদ্বেষকে উস্কে দেবার চেষ্টা শুরু করেছেন। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, ড° বরপূজারী মুসলিম অনুপ্রবেশের ধুয়া তুলছেন বলে হিন্দু বাঙালিদের নিশ্চিত থাকার কোনো কারণ নেই। দেশ বিভাগের আগে প্রথম অভিবাসী মুসলমানদের বাঙালিত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল ছলে ও বলে।

দেশভাগের পরে বাঙালি হিন্দুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকারের ওপর আঘাত হানা হল গোয়ালপাড়া ও নগাঁওতে বিশেষভাবে। ১৯৭৯ সাল থেকে বিদেশি ও অনুপ্রবেশকারী ছিল মুসলমান, এখন শুরু হয়েছে হিন্দু বাঙালিকে বিদেশি বানানো আর দেশ থেকে বিতাড়নের জন্য নোটিশ দেওয়া। সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ঘোলাজলে মাছ ধরার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। এটা আরও খারাপ। অতীতে হিন্দুও পা দিয়েছে এ রকম ফাঁদে, মুসলমানরাও দিয়েছে। কিন্তু কেউ বাঁচতে পারেনি। এবার এসব পরিচয় পেছনে থাকুক, ভাষিক ও জাতীয় পরিচয় সামনে আসুক। সুস্থ মস্তিষ্কে সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের দাবির ভিত্তিতে আমরা ঐতিহাসিক ও বাস্তব পটভূমিকায় বরাকের স্বার্থে শুধু নয়, আসাম তথা সমগ্র রাষ্ট্রের স্বার্থেও বটে, আমাদের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আগত পুনরাবর্তনকারী হুমকি ও আগ্রাসনের সমাধান খুঁজি। ◆

অস্তিত্বের সংকট ও আমাদের আত্মানুসন্ধান

অনুরূপা বিশ্বাস

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বৃহৎবঙ্গ ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গ সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হল— এপার বাংলা আর ওপার বাংলা। এই গণ্ডির বাইরে রইল এক বিশাল ভূখণ্ড। ইতিহাস আর ভূগোলের মধ্যে সৃষ্টি হল কৃষ্ণগহ্বরের। অনস্তিত্বের শিকার হল বরাকভূমি। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আত্মানুসন্ধান করেছেন লেখিকা।

বরাক ভুবনের গণমানসে অনির্বাণ দীপশিখা রূপে একষট্টির উনিশে মে, ভাষা শহিদের আত্মদানের প্রথম দিনটির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পূর্ণ হলো এবার। পূর্ববর্তী বছরগুলিতেও আমরা আত্মানুসন্ধানে আত্মসমালোচনা করেছি। তাতে আমাদের মাতৃভাষা প্রেম বা দেশপ্রেমে কোনও খাদ ছিল না, যদিও দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতায় অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সেই সব সীমাবদ্ধতা থেকে চিন্তাধারাকে মুক্ত করা যায় কিনা এর ঘনিষ্ঠ প্রয়াস অবশ্যই নেবেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা। ১৯৬১ এর ৫ই ফেব্রুয়ারি করিমগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত জনসম্মেলনে ভাষা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ' এর জন্ম হয়েছিল। সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল - আসাম রাজ্যে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্য ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্য ভাষা বিলের সংশোধন। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফল হিসাবে শাস্ত্রী ফর্মুলায় রাজ্যভাষা আইন সংশোধিত হয়েছিল ঠিকই, তবে তাতে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের দাবি আদায় হয় নি অর্থাৎ আসাম রাজ্যে অন্যতম রাজ্য ভাষা রূপে বাংলাভাষার স্বীকৃতি মিলে নি, শুধু বরাক উপত্যকার জন্য বাংলা ভাষার রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্বীকৃতিটুকু মিলেছিল। প্রবল গণ আন্দোলনের চাপের ফলে বরাকের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা কৃষ্টিগত অধিকার কেন্দ্র স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু মাতৃভাষার ন্যায্য অধিকারের যথাযথ মর্যাদা রক্ষার মূল দাবিটি পূরণ করা হয় নি। সেই সংগ্রাম আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

মাতৃভাষার মর্যাদারক্ষার সংগ্রামে 'উনিশ মে' কিন্তু হঠাৎ আসেনি। গত একশো বছরের ইতিহাস একথাই

বলে যে বরাক উপত্যকা বরাবরই ছিল উপেক্ষিত এবং আসামে বাঙালিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বৈষম্য ও বঞ্চনা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বাধীনতার পর থেকে এই উপত্যকাকে কেন্দ্র ও রাজ্যের নয়া উপনিবেশ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে উনিশের বার্তা পৌঁছে দিতে হলে সংগ্রামের পারিপার্শ্বিকতা অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। তাই আলোচনায় ইতিহাসের প্রসঙ্গ নিশ্চিতভাবে উঠে আসবে।

এই অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নূতন নয়। বহুজাতিক, বহুভাষিক এই রাজ্যটিকে এক ভাষা-ভাষী ও এক সাংস্কৃতিক পরিচিতিতে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর শাসকদল ও গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকেই এ বিষয়ে সজাগ ও সক্রিয় ছিল। সমতল ও পর্বতের অনসমিয়া ভাষাভাষী জাতি-উপজাতি গোষ্ঠী স্বৈরাচারী আক্রমণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পৃথক হতে চেয়েছিল - সেও অনেককাল আগের কথা। দেখা যাচ্ছে ১৯৩৮ সালেই কাছাড়, লুসাই পার্বত্য এলাকা, মণিপুর ও ত্রিপুরা মিলিয়ে পূর্বাঞ্চল প্রদেশ গঠনের দাবি উঠেছিল। ব্যাপক জনসমর্থিত এই দাবি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছিল। পেশ করেছিল এই সব অঞ্চলের শাখা কংগ্রেস কমিটিগুলি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই দাবি অনুমোদন করে সংগঠনের গঠনতন্ত্রে এই অঞ্চলগুলির সমাহারে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুর্নগঠনের বিষয়টি গ্রহণ করেছিল। তবে এই সময়ে ভারতের সংবিধান রচনার জরুরি কাজটির জন্য সাময়িকভাবেই বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। অবশ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তখনই নির্দেশ দেন যে কাছাড় ও ত্রিপুরার বাংলা ভাষা ও মণিপুরে মণিপুরী ভাষার উপর হাত দেওয়া চলবে না।

(তথ্যসূত্র : আসামের উপেক্ষিত : এপ্রিল ১৯৫৫ ইং কাছাড় রাজ্য পুর্নগঠন সমিতি, শিলচর)

১৯৪৮ সালে পূর্বাচল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। তার জের চলছিল প্রায় দশবছর। ঐতিহাসিক এই অস্তিত্বের সংগ্রামের পক্ষে বিপক্ষে নানা কথা জনসমাজের বিলীয়মান স্তরে এখনও বেঁচে আছে। এ নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিভেদসৃষ্টির প্রয়াসে বাতাসে বিষ ছড়িয়েছিল। অথচ ঐতিহাসিক কিছু কিছু চিঠিপত্র, স্মারকপত্র ইত্যাদি দলিল থেকে এটা পরিষ্কার যে স্থানীয়ভাবে হিন্দু-মুসলমান, স্থানীয়-বহিরাগত এইসব বিভাজনে রাজ্যের কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাজ্য পুর্নগঠন আটকে দিয়েছিল এই আশঙ্কায় যে — কাছাড় আলাদা হয়ে গেলে শোষণের ক্ষেত্র সংকুচিত হবে। সম্মুখীন হতে হবে বিপুল আর্থিক ক্ষতির। সেই থেকে স্বাধীন দেশে বরাক উপত্যকা এক অবহেলিত উপনিবেশ। আর্থিক শোষণ গত ষাট বছর ধরে নির্বিবাদে চলতে থাকল, বঞ্চনা বৈষম্য নির্বিচারে অপ্রতিহত অভিযান চালিয়ে গেল আর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ভাষা ও সংস্কৃতির উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নয়া নয়া কৌশল চক্রান্ত করে চালানোর ব্যবস্থা বেশ নিপুণভাবে চলল। এইভাবে পুরোদস্তুর তাবেদার বানাবার জন্য উপত্যকার ভিতরে দালালশ্রেণীর পঞ্চম বাহিনী বেশ ভালোভাবেই তৈরি হয়ে গেল। এরা এখনও বহাল তবিয়তে চক্রান্তকে কার্যকরী করার কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। বারবার এদের দ্বারা বিপন্ন হচ্ছে বরাকের সুস্থ সমাজবিন্যাস ও স্বতন্ত্র পরিচিতি। গত ছয় দশকে বরাক উপত্যকার ভাষা-সংস্কৃতিকেন্দ্রিক ও শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সাফল্যের খতিয়ান কম নয়। ১৯৬১ র পর ১৯৭২ এবং ১৯৮৬ তে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধে স্বাধিকার সংরক্ষিত রাখা গেছে। তবে এই সব মহান গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সময়কার সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা বা দুর্বলতা বিষয়ে সজাগ থেকে আত্মসমালোচনা করার প্রয়োজন বেশি করে অনুভূত হচ্ছে এখন।

১৯৬১ এর ভাষা সংগ্রামের পরিচালক সংগঠনের জন্মদাতা জনসম্মেলনের (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১) ৩নং প্রস্তাবে আছে — যদি বাংলাকে আসামের অন্যতম রাজ্য ভাষা না করা হয় তবে কাছাড় জেলাকে প্রয়োজন বোধে

সংলগ্ন অন্যান্য অনসমীয়া ভাষাভাষী অঞ্চল সহ রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক সংস্থা গঠন করা হোক। প্রতি দশকেই কোনও না কোনওভাবে বাংলাভাষী এই ভূখণ্ডের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যসূচক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠে আসছে। কেন ব্যাপক জনসমাজ বা একাংশ থেকে বারবার পৃথক হবার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়? কী তার প্রেক্ষিত? উনিশের আলোকে এ বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

উনিশের উত্তরাধিকারের ভাবনার বোধ হয় এটাই সবচেয়ে জরুরি। একটি জাতি বা বিভিন্ন জাতির নিজস্ব ভাষা যথার্থ মর্যাদাবঞ্চিত হলে যে অবমাননা হয় যেটা যে কোনও আত্মসচেতন জাতি বা জাতি গোষ্ঠীর পক্ষে দুঃসহ ব্যাপার। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। আসাম থেকে একে একে সরে গিয়ে পার্বত্য উপজাতিরা পৃথক রাজ্য গড়ে নিয়েছে কেন্দ্রের আনুকূল্যে। সমতলীয়দের মধ্যে বোডোদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম একদিকে সন্ত্রাসবাদের বাঁকা রাস্তা ধরেছে অন্যদিকে এই সংগ্রামের একাংশ আপসের পথ ধরে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের অংশভাগী। কার্বি ও ডিমাছারা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে সোচ্চার। বরাক উপত্যকা এখনও লেজুড় হয়ে ঝুলছে। নিরাশাব্যঞ্জক এই প্রেক্ষাপটে আশার বাতি একটাই — এখানে ভাষা ও সংস্কৃতির শিখাটি দেদীপ্যমান রয়েছে। আর্থ - রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজ্যস্তরীয় আধিপত্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এখনও দানা বাঁধেনি। শিক্ষা ক্ষেত্রে চোরাগোপ্তা আক্রমণ অবিরাম চলছে। ঠিক এই জায়গাটিতেই আমাদের ভাষার অধিকার কতটা ব্যাহত হচ্ছে এবং আসাম রাজ্যে বাংলা ভাষাকে কীভাবে পঙ্গু করে দেবার ব্যবস্থা সরকারিভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা গভীরভাবে দেখা প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেভাবে এবং যতখানি গর্জে ওঠার কথা ছিল তা কিন্তু হচ্ছে না। এর একটি কারণ হতে পারে বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পাওয়া, যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় মধ্যবিত্ত সমাজ জীবন বৃত্তে। বর্তমান সময়ে সমাজে স্বচ্ছল যারা, তারা অবশ্যই সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় বাংলা স্কুলের ধার মাড়ান না। কিন্তু সমাজের যে বিরাট অংশ রয়েছে এর বাইরে তারা অনুবাদের মাধ্যমে বিকৃত বাংলাকে মাতৃভাষা বলে গ্রহণ করার বিপদ ভবিষ্যতের পক্ষে কতখানি মারাত্মক হয়ে উঠবে তা ভেবে দেখা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা দরকার। গণআন্দোলন দ্বারা গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়াটাই বোধ করি এই বিপদজনক সময়ের দাবি।

সভ্যতার বিস্তারের সময়ে ক্রমে অতীতে ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে যে বিশাল অখণ্ড বঙ্গভূমির জন্ম হয়েছিল সেই বৃহৎ বঙ্গের আদি বাঙালির আত্মপরিচয় অর্জনের সময়ে, জাতিত্ব গঠনের কালে রাষ্ট্রপ্রাধান্য নিরামক শক্তি ছিল না। সমাজ সংগঠনই ছিল প্রকৃতিগত এই মিলনের মূল ধাত্রী। সাহিত্য এই স্বাভাবিক মিলনের বার্তাবহ রূপে কাজ করেছিল। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' চিরায়ত এই বাণীর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিল। অবশ্য আমাদের বাঙালি জাতীয় চেতনা মূর্ত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের সময় ১৯০৫ সালে — তার আগে ঘনবদ্ধ হয়েছিল বাংলার নবজাগরণ জাগানো উনিশ শতকের ভাবান্দোলনে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস যেখানে সমাজ সংগঠনই ছিল ইতিহাসের নিরামক শক্তি।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বৃহৎ বঙ্গ ভেঙে তিন টুকরা হয়ে গেল। সে এক বিপন্ন সময়। গোটা পূর্ববঙ্গ রাতারাতি ভিন্ন রাষ্ট্ররূপে পূর্বপাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অংশ হয়ে গেল। বঙ্গভূমির নূতন নাম হলো পশ্চিমবঙ্গ আর সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বাংলাভাষা ভাষী মানুষদের বাসভূমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মূল থেকে। তখন থেকেই প্রান্তিক অঞ্চল রূপে বঙ্গভাষাভাষী এই ভূখণ্ডের মানুষ অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হলো। আমাদের ইতিহাস আর ভূগোলের মধ্যে সৃষ্টি হলো এক কৃষ্ণ গহ্বরের —আমরা অনস্তিত্বের শিকার হলাম। পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গ সাধারণ মানুষদের কাছে পরিচিত হলো এপার বাংলা আর ওপারে বাংলা নামে। এই গণ্ডির বাইরে পড়ে রইল বিশাল এক ভূখণ্ড যার কোনও নাম নেই। দীর্ঘদিনের রক্তস্নাত ভাষা-সংগ্রামের ফলে সচেতন বরাক উপত্যকার

মানুষ নিজেরাই নাম দিয়েছেন ঈশান বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এই নামগুলি দেশ পরিচিত হতে পারে তবে 'ঈশান বাংলা' কেন নয়? 'ঈশান বাংলা'র চৌহদ্দির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যও পড়ে। তবে সেটা তো স্বতন্ত্র রাজ্য। সেই রাজ্যে বাংলাভাষার কোনও বিপদ নেই। বরাক উপত্যকার কবি সাহিত্যিকরা আপন অঞ্চল ভূমিকে 'তৃতীয় ভুবন' বলতে অভ্যস্ত। খুব ভালবেসে তারা এই নামে ডাকেন জন্মভূমি মা'কে। এইভাবেই রাজনীতির পাশাখেলায় জনজীবনে আসে বিপর্যয়। প্রবল ঝড় ঝঞ্জার আকারে আসা এমন সব বিপদে মানুষ তবু পরাজয় মানে না। বাংলা ভাষার এমনই প্রাণশক্তি, এমনই বিচিত্র তার অভিযাত্রা যে এই ভাষা কোনদিনই লুপ্ত হবে না জানি, তাই বরাক উপত্যকার মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষ রক্ত ঝরিয়েও ভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করবে। এই ভাষা ও সংস্কৃতির আছে অক্ষয় পরমায়ু। প্রয়োজন শুধু আমাদের সদা জাগ্রত থাকা। উনিশের উত্তরাধিকারে আছে বাঙালি অখন্ড ভাষা সংস্কৃতির চেতনা, আছে বরাক উপত্যকার বাঙালি জাতি সত্তার ঘনবদ্ধ হবার প্রেরণা। অমর উনিশ মে'র সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তিতে আসুন, আমরা এই উপত্যকার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ 'বাঙালি' বলে আত্মপরিচয় দিয়ে বলীয়ান হই, হই গরীয়ান।। ◆

চেতনার জাগরণ

সুবীর কর

বরাকের বাঙালির আত্মপরিচয় নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হয়েছে বঞ্চনা আর বিপন্নতা। এসবের বিরুদ্ধে চেতনার জাগরণ ঘটাতে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষার অঙ্গন থেকে দীর্ঘদিন ধরে চলছে প্রয়াস। এখানে এ সবেরই চিত্রায়ন করেছেন লেখক।

শ্রীহট্ট-কাছাড়ের বাঙালির ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জাতি পরিচয়ের মাশুল গোণার কাল শুরু হয়েছে সেই ১৮৭৪ সাল থেকে। তখন সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এর সূচনা ঘটল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও তার পরবর্তী সময়ে।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড গেইট্ সম্পাদিত আদম সুমারির রিপোর্ট এবং ১৯০৯-এর ইম্পিরিয়াল গেজেটগুলির মধ্যে এই অঞ্চলের বাঙালির ভাষা ও জাতিগত পরিচয় প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। স্বনামধন্য অসমিয়া সাহিত্যিক বেণুধর রাজখোয়া ১৯০৩ সালে 'Notes on the sylheti dialect' নামে একখানি বই প্রকাশ করে এই সত্য প্রতিপাদনে প্রয়াসী হন যে, শ্রীহট্ট-কাছাড়ে প্রচলিত বাংলা ভাষা আসলে অসমিয়া ভাষারই উপভাষা মাত্র। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই প্রয়াস ও প্রচারের বিরুদ্ধে সত্য ও তথ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে সে সময়েই গঠিত হল 'সুরমোপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনী'। শুরু হল সুরমা উপত্যকার বাঙালির আত্মপরিচয়কে তুলে ধরার ও তা প্রমাণ করার দুর্বার প্রয়াস। ১৮৭৪ এর পর থেকেই উঠেছে এই প্রশ্ন -- 'শ্রীহট্ট-কাছাড়বাসী কি বাঙালি?' এই প্রশ্নের উত্তরে রক্তের বিনিময়ে, প্রাণের মূল্যে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে বাংলাভাষার মর্যাদা। আজও দিতে হয় বরাক উপত্যকার বাঙালিকে।

উনিশ শতকে আত্মপরিচয়ের মর্যাদা ও সাহিত্যিক, ভাষিক পরিচয়ে আমরা বাঙালি এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে সুরমোপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনী গঠিত হয়েছিল তার প্রথম অধিবেশন বসে ১৩২১ সনে করিমগঞ্জ শহরে। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন 'দেবীযুদ্ধ' কাব্যপ্রণেতা শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মৌলবিবাজারে, ১৩২৩ সনে। এই

অধিবেশনে মুখ্যত ভাষা ও সাহিত্যের উপর আক্রমণ ও আগ্রাসনের বিষয়টিই গুরুত্ব লাভ করে। অধিবেশনের সভাপতি ভুবনমোহন দেবশর্মা যে লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন তার মধ্যে বিরুদ্ধবাদীদের কূট প্রশ্নের সকল উত্তরই দেওয়া হয়েছিল।

দেশভাগ পরবর্তী বিপর্যস্ত জীবনে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকাশের ক্ষেত্রটি অনুকূল ছিল না। এরপর বঙাল খেদা ও অসমিয়াকে রাজ্যভাষা করার আন্দোলন, বাংলাকে দ্বিতীয় রাজ্যভাষার স্বীকৃতির দাবিকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ আসামের বাঙালির সার্বিক অস্তিত্ব যখন তীব্র সংকটের সম্মুখীন সেই পরিস্থিতিতে ভাষা সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বে সমগ্র বরাকে বিশেষ করে করিমগঞ্জে গড়ে উঠল সাংস্কৃতিক দল। এই দল নিখিল আসাম বঙ্গভাষাভাষী সম্মেলনে যোগ দিতে করিমগঞ্জ থেকে শিলচর পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। ওই সময় জেলার বিভিন্ন স্থানেও গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। সাহিত্য ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কবি লেখকদের অধিকাংশই ছিলেন নিরাপদ দূরত্বে। সে সময় সংস্কৃতির মাধ্যমে জনজাগরণে সবচেয়ে সক্রিয় ও সচেতন ভূমিকা পালন করেছিলেন কবিগানের চারণিকেরা। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে যেসব গোষ্ঠী উদ্যোগী হয়েছিলেন তারাও ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক আবেগ ও চেতনার উজ্জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সত্তর দশকের গোড়ায় শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চেতনার যে বিকাশ ঘটে তা কোন সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলন রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার সংকট ও ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় 'কাছাড় শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি' নামে সংগঠন গড়ে তুলে সংগ্রামী ভূমিকা পালনে এগিয়ে এলেন। ক্রমে তাঁরা অনুভব করলেন যে নিরন্তর শৈক্ষিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্যে সর্বস্তরের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলনে একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন যা একদিকে এই উপত্যকার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রকে উজ্জীবিত ও প্রসারিত করবে এবং অপরদিকে প্রবল সংকটের প্রত্যাহ্বানে নিজ অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদার প্রতি দায়বদ্ধতা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হবে। তার গভীরে মূলত একটি লক্ষ্য ছিল যে, মননের বিকাশের পাশাপাশি ভাষিক ও সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত ও অটুট রাখা, রাজ্যের বহুভাষিক চরিত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষিক গোষ্ঠীর উন্নয়ন ও বিকাশের প্রতি যত্নবান থাকা ও তাদের অধিকার আদায়ে সমর্থন জ্ঞাপন। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৭ সালে জন্ম নিল 'কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন' এবং পরে করিমগঞ্জ মহকুমা জেলায় উন্নীত হলে নাম পরিবর্তন করে হল 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন'।

কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ২৪ ও ২৫শে পৌষ (৮ ও ৯ জানুয়ারি, ১৯৭৭) শিলচর শহরে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্য এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক ও পরিব্রাজক প্রবোধকুমার সান্যাল। সেদিন অসম সাহিত্য সভার জন্য আমন্ত্রণের দরজা ছিল খোলা এবং একদল প্রতিনিধিও যোগ দিয়েছিলেন এই অধিবেশনে। দাবি উত্থাপিত হয়েছিল এই বলে যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও গবেষণার জন্য কাছাড় জেলা ও মহকুমার গ্রন্থাগারগুলির সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ, আকাশবাণী শিলচর কেন্দ্রের মান উন্নয়নে তিন মহকুমার বুদ্ধিজীবী ও বৃত্ত ভিত্তিক প্রতিনিধিদের নিয়ে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন, ত্রুটি মুক্ত পাঠ্য পুস্তক (অসমিয়া শব্দের অনুপ্রবেশে বাংলার বিদূষণ ও বিকৃতির প্রতিবাদে) প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং উপত্যকার জাগরণ ও বিকাশ। যাত্রাপথের এই শুরু ছিল প্রতিকূল। পদে পদে ছিল ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং বাঙালির সংগে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ঐক্য ও

সম্প্রীতির মধ্যে বিভাজনের কূট ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার। স্থানীয়-বহিরাগত, জাতি-উপজাতি, ভূমিপুত্র-উদ্বাস্তু, হিন্দু-মুসলমান এসব প্রশ্ন তুলে উগ্র অসমিয়া জাতিবাদীরা ক্ষমতার ছত্রছায়ায় সুদীর্ঘকাল থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, নিয়োগ, রাজনীতি এক কথায় জীবন যাপনের সার্বিক ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করছে বঞ্চনা ও বিপন্নতা, এসবের বিরুদ্ধে সচেতন জাগরণের ক্ষেত্রে বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ভূমিকার প্রতি ক্রমে জনগণের আস্থা ও ভরসা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছাল যে এই সম্মেলন বরাকের বাঙালির স্বাভিমানের প্রতীক হয়ে দেখা দিল।

একাদশ শহিদের আত্মবলিদানের পঞ্চাশ বছর পূর্তির প্রণতির দিনে এ কথাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে যে, কাটিগড়ায় অনুষ্ঠিত সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনটি মহান ১৯শে মে স্মরণে ১৩৯২ বঙ্গাব্দের ৪ ও ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৮ ও ১৯ মে, ১৯৮৫) অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের অনুষ্ঠানস্থল নিয়ে সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে সম্মেলনের একনিষ্ঠ সদস্য ইমাদ উদ্দিন বুলবুলের নিরলস উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এক সফল অধিবেশন হয়ে উঠে। এই অধিবেশনে প্রধান অতিথি তারাপদ রায় ও বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী হোমেন বরগোহাই শহিদ তর্পণে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এর পর থেকে ক্রমে সমগ্র উপত্যকা জুড়ে এই সম্মেলনের শাখা ছড়িয়ে পড়ে। সৃজনের উদ্দীপনায় লেখা ও প্রকাশিত হতে থাকল অজস্র কবিতা, পত্র-পত্রিকা, রম্য রচনা, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে উদ্যোগ নিল গ্রন্থ ও সংকলন প্রকাশের। উদযাপিত হল ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ, সাংস্কৃতিক উজ্জীবন বর্ষ। শিল্পি সাহিত্যিকদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হল মুক্ত মঞ্চ। নাগরিক ও লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র হল প্রসারিত। শহিদের আত্মত্যাগের চেতনায় অবগাহিত হল জীবনের স্পন্দন। সম্মেলনের এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথ যাঁদের নেতৃত্ব, ত্যাগ ও অবদানে অবরুদ্ধ জীবনের শিথিলতাকে দূর করে বরাকে বাঙালিকে দুঃসহ অপমান থেকে উদ্ধার করল তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী।

আসাম চুক্তির প্রতিবাদে, কুখ্যাত সেবা সার্কুলারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, উগ্রজাতীয়তাবাদী আসামের বহুভাষিক চরিত্রের প্রতি বিদ্বেষী অসম সাহিত্য সভার আগ্রাসন ও হাইলাকান্দিতে আয়োজিত অধিবেশনের কূট ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে উপত্যকার শিল্পি সাহিত্যিকদের প্রতিবাদী আন্দোলনে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন যে ভূমিকা পালন করেছিল তা ছিল ঐতিহাসিক। কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিৎ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বরাক উপত্যকার সত্য ও তথ্য' পুস্তিকাটি বরাকের বাঙালির অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগকারীদের অপপ্রচারকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

বহুভাষিক আসামের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সংহতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তুলতে হাইলাকান্দিতে অভিবর্তন করে এই সম্মেলন তার দায়বদ্ধতাকে প্রমাণিত করেছে। দেশভাগ পরবর্তী কালে আসামে বাঙালিকে অবাঞ্ছিত উপদ্রব ও জাতির উন্নয়ন ও বিকাশের শত্রু বলে চিহ্নিত করে বাঙালি মুক্ত আসামের যে পরিকল্পনা ও নীতি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল সেই লক্ষ্য পূরণের রাজনীতি আজও বাঙালিকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। ষাটের দশকের দাঙ্গা বিশেষ করে গোরেশ্বরে যে বর্বর হত্যা কান্ড সংঘটিত হল তার স্মৃতি ও বেদনা এখনও উৎপীড়িত স্বজনহারাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। আজ এই একাদশ শহিদের আত্মত্যাগের পঞ্চাশতম স্মৃতি স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কালে আবারও রাজ্যের বিপন্ন বাঙালির জীবনে ঘনায়মান গভীর সংকট আশংকা ও উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। অভিশপ্ত এই বাঙালি জাতি রাজনীতির ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে আজ অসহায় ও দিশাহীন। বাঙালি পরিচয়ে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন ভেদ নেই বলে যতই আমরা আত্ম গরিমা বোধ করিনা কেন পরিস্থিতির বাস্তবতা সবসময় বিপরীত অবস্থানকেই সপ্রমাণ করে। এমতাবস্থায় আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিতকে সুদৃঢ় করে তোলা একান্ত জরুরি। ◆

উনিশের চেতনা ও বরাকের বাংলা কবিতা

তুষারকান্তি নাথ

একষট্টির মহাসংগ্রামের কথা এই অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদেরও শক্তি যুগিয়েছে, এই অঞ্চলের সাহিত্যচর্চাকে বেগবান করেছে। গেল শতাব্দীর আশির দশক থেকে বরাকের বাংলা কবিতার সুর বদলের দিকটি তুলে ধরে লেখক দেখিয়েছেন শব্দের মালায় কবি-সাহিত্যিকরা উনিশের চেতনাকে বেঁধেছেন।

উনিশে মে বলতেই বরাকবাসীর চেতনায় ভেসে ওঠে ১৯৬১ সালের রক্তঝরা একটি দিনের কথা। উনিশে মে নিজেই এক ইতিহাস। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক মহাসংগ্রাম আর ত্যাগের ইতিহাস। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় গোটা বরাক উপত্যকায় যে দৃপ্ত উত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা আজও এখানে এক বিরল উদাহরণ। প্রবল প্রতিরোধ, প্রতিবাদ ও সংগ্রামের মাধ্যমে এখানকার জনগণ তাদের ভাষিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়টি অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যে কোনও জাতির ইতিহাসে কোনও বড় ঘটনা কিংবা কোনও আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টিশীল মানুষদের নাড়া দিয়ে যায়। এর প্রভাব পড়ে সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে। উনিশে মে-র এগারো শহিদের আত্মাহুতির ঘটনা বরাক উপত্যকা ও পশ্চিমবঙ্গের লেখক-কবি-শিল্পী-সাংবাদিক সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রচণ্ডরকম নাড়া দিয়েছিল। মনীশ ঘটক, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), দক্ষিণারঞ্জন বসু, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ কবিরাও কবিতায় হয়ে উঠেছিলেন প্রতিবাদমুখর।

১৯৬১-র এই মহাসংগ্রামের কথা, জনজোয়ারের কথা, শহিদের মহান আত্মাহুতির কথা ষাটের দশকের লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে বা এখানকার সাহিত্যে খুব বেশি প্রতিফলিত হয়নি। সত্তরের দশকেও হয়েছে আরেক দফা আন্দোলন। ষাট-সত্তর দশকের ভাষা সংগ্রাম বরাক উপত্যকার কবিদের মনে রেখাপাত করে গেলেও তা তেমন কোনও অবারিত স্রোতধারার মতো সাহিত্যের পাতায় ধরা পড়েনি। অথচ এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত গভীর। বস্তুত ষাট-সত্তরের দশকে যা ছিল না, তা সম্ভব হয়েছে আশির দশকে কিছু তরুণের সাহিত্যচর্চা তথা লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনার মধ্য দিয়ে। রক্তাক্ত ভাষা সংগ্রাম তাদের চেতনাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। আর গত

শতাব্দীর আশির দশকেই বরাকের সাহিত্যে এক বড়ধরনের বাঁক পরিবর্তন লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। এই দশকেই বরাকের সাহিত্য হয়েছে গ্রামমুখী। এ প্রসঙ্গে ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য লিখেছেন — 'আমি বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাসের সমর্থনে প্রমাণ দিতে রাজি আছি যে, ৮০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বরাক উপত্যকার সাহিত্য গ্রামমুখী। প্রচার মাধ্যমে যারা প্রচার চালাচ্ছেন তাঁরা বাস্তব সত্য জানেন না আর নয়ত জানতে আগ্রহী নন' (খেলাঘর : শারদ সংকলন ১৩৯৭ : সমীপেষু : পৃঃ ২)। ওই সময়ে সাহিত্য গ্রামমুখী হয়েছে গ্রাম থেকে উঠে আসা একদল তরুণের আন্তরিক কাজকর্মে। এঁরা গ্রামাঞ্চল থেকে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা শুরু করেন। এসব লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্রে আরেক নতুন মাত্রা যোগ হল, আর তা হল ভাষা সংগ্রামের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া, বহির্জগতের কাছেও উনিশে মে-র গৌরবময় আবেদন পৌঁছে দেওয়া। এঁদের লেখনিতে ভাষাসংগ্রাম ও উনিশের চেতনা ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। এঁরা পরিচয় দিয়েছেন সংগ্রামী চেতনার।

ষাট-সত্তরের দশকের সাহিত্যে এক বিশাল শূন্যতা আশির দশকে নতুন প্রজন্মের কবি ও লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকরা অনুভব করেছিলেন। সাহিত্যপত্র 'ইত্যাদি' (নবমবর্ষ : পঞ্চদশ প্রকাশ : ১৯৮৮)- র সম্পাদকীয় নিবন্ধে এভাবে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে — 'একথা এখন নির্দ্বিধায় বলা যায় বরাক উপত্যকার এ দশকের কবিরা সমাজ-সময় ও সর্বোপরি এ অঞ্চলের মানুষের ক্ষোভ, বিদ্রোহ ও মাটির গন্ধ নিয়ে কবিতা লিখে যাচ্ছেন। যা গত দুই দশকে বরাকের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়নি। ... গত দুই দশকে বরাকের কবিরা মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, তৎকালীন সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে লিখে গিয়েছিলেন কবিতা। সময়ের কোনও পদছাপ আমরা দেখতে পাই না সে সময়ের কবিতায়, এ এক ধূসর শূন্যতা আমাদের কাছে।' সত্তর দশকের শেষদিকে শুরু হওয়া দুরারোগ্য ব্যাধির মত আসাম আন্দোলন, নৈরাজ্য, রিরংসা, ভাষা সার্কুলার, বরাকে আবার ভাষা-সংগ্রাম, অস্তিত্ব সঙ্কট, সমকালীন সময়ের নষ্ট রাজনীতি ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জন্য আশির দশকের কবি ও লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকরা ঝলসে উঠেছিলেন। উনিশের চেতনা তাঁদের শক্তি যুগিয়েছে। তাঁরা লিখেছেন প্রতিরোধ-কবিতা। এ পর্যায়ে যাদের নাম উঠে আসে তাঁরা হলেন — বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, জালাল উদ্দিন লস্কর, সুজিৎ দাস, স্নিগ্ধা নাথ, স্মৃতি পাল, দিদারুল ইসলাম, দিগ্বিজয় পাল, শেলী দাসচৌধুরী, আশিসরঞ্জন নাথ, তুষারকান্তি নাথ, পার্থপ্রতিম মৈত্র, পীযূষকান্তি নাথ, মাশুক আহমদ, সুশান্ত কর, পরম ভট্টাচার্য, আশুতোষ দাশ, শোভনলাল ভট্টাচার্য, জয়দেব ভট্টাচার্য, তপনকান্তি নাথ, স্বপন দাশগুপ্ত প্রমুখ। আর আশির দশকে প্রকাশিত কলিযুগ, খেলাঘর, চম্পাকলি, অনির্বাণ শিখা, প্রহরী, প্রবাহ, ইত্যাদি, গণআরশি, দিশ্বলয়, ঘোড়সওয়ার, প্রতিস্রোত ইত্যাদি সাহিত্যপত্রের উনিশের সংকলনগুলো উনিশের উন্মোচিত-ফলক তৈরিতে বিরাট অবদান রেখেছে। বস্তুত বরাকের সাহিত্যচর্চার ধারায় আশির দশক ছিল এক অত্যুজ্জ্বল সময়। বিবর্ণ সময়ের বিপ্রতীপে আশির দশকের কবি ও সাহিত্যপত্রগুলোর ছিল উজ্জ্বল উচ্চারণ। অথচ বরাক উপত্যকার সাহিত্য-আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে এই দশকের কথা সামান্য স্পর্শ করেই শেষ করেন।

একথা স্বীকার্য যে, বরাক উপত্যকার কবিতায় ষাট-সত্তর দশকও ছিল উল্লেখযোগ্য সময়। 'অতন্দ্র' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল কবি একটা প্রচণ্ড ঢেউ তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবিতার সামুদ্রিক বিস্তার ঘটেছিল এখানে। কিন্তু ১৯৬১-র মহান ভাষা-সংগ্রামের চেতনা ও সমকালীন সময়ের নৈরাজ্য-বিপর্যয়-সঙ্কট-ক্ষোভ তাঁদের কবিতায় প্রতিফলিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে কবি-প্রাবন্ধিক অনুরূপা বিশ্বাসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'ষাটের দশক থেকে উদ্যত বিপদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত এই আন্দোলন গোড়ার দিকে কবি-সাহিত্যিকদের মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি। বেশিরভাগ ব্যস্ত ছিলেন মগ্ন-চেতনার গভীর থেকে ডুবুরির মত মণিমুক্তো চয়নে। আর এ সবই ছিল ব্যক্তিগত অনুভব সঞ্জাত' (উনিশের স্মরণিকা : শিলচর শহর আঞ্চলিক কমিটি, ব. উ. সা. স. স. : ১৯৮৭

: পৃঃ — নেই)। অন্যত্রও তিনি সখেদে বলেছেন : 'উনিশে মে যে বিরলতম ঘটনা ঘটেছিল, বরাক উপত্যকার ব্যাপক জনজীবনে যে বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিশাল অভ্যুত্থান ও জনজাগরণ সমসাময়িক কবি, লেখকদের মায়াঘুম ভাঙাতে পারেনি। তাঁরা তাঁদের স্বেচ্ছাবৃত সৃষ্টির ভুবনে মগ্ন ছিলেন তখনও' (প্রসঙ্গ বরাকের সাহিত্য : ২০০১ : পৃঃ ১১)। মননশীল সমালোচক তথা বরাক উপত্যকায় সমুচ্চ বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত অধ্যাপক আবুল হোসেন মজুমদারও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন : 'দেশ বিভাগ-জনিত অস্থিরতা, বাস্তুহারা মানুষের জীবন সংগ্রাম, হিন্দু-মুসলিম অবিশ্বাস, আরও কত কী। ষাটের দশকের শুরুতেই ভাষা আন্দোলন। একাদশ শহিদের রক্তে শিলচরে রক্তস্নান। এসব ঘটনার কোনও ছায়াপাতই কি প্রত্যাশিত ছিল না ষাটের কবিদের কাছে? দুঃখের বিষয় অতন্দ্র-গোষ্ঠীর কবিরা সে প্রত্যাশা পূরণ করেননি একেবারেই। ... সুখকর চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে আশির দশক। ... আশির দশকের বরাকের কবিতায়, বিশেষত নতুন কবিদের লেখায় ক্ষোভের সঙ্গে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, আশা-নিরাশার দোলাচল এবং পরিবর্তন কামনা একটা যুগলক্ষণ। এরা এমনকী প্রেমকেও অস্বীকার করেন, অথবা জৈবিক কামনাকে দূরে রেখে মৃদুপ্রণাম জানিয়ে কাজ শেষ করেন। ষাটের দশকের কাব্যচর্চার সঙ্গে আশির দশকের কাব্যচর্চার প্রভেদ ও পার্থক্য এখানেই' (বরাক উপত্যকার কবিতায় সমাজমনস্কতা, আশির দশকে (নিবন্ধ) : প্রবাহ : আগস্ট-অক্টোবর ১৯৯২ : পৃ: ৩৫, ৩৭-৩৮)। তিনি আরও বলেছেন: '১৯ শে মে ১৯৬১ সালের পরে উঠে এসেছে একটা নতুন প্রজন্ম। এদের কেউ কেউ সে সময় ছিলেন নিছক শিশু, কারও জন্মই হয়নি। বড় হতে হতে এরা লক্ষ্য করলেন আমাদের স্ববিরোধিতা, অবক্ষয়, বঞ্চনা, রাজনীতির জুয়াখেলা, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাজনিত ফ্রাস্ট্রেশন থেকে এরা হয়ে উঠলেন সংগ্রামী, প্রতিবাদী, প্রতিরোধী। শিল্পীর সংবেদনশীলতা এদেরকে টেনে নিল ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেঁচে থাকা মানুষের কাছে। তাদের যন্ত্রণা, তাদের সংগ্রামের শরিক হলেন এরা। আশির দশকে বরাকের কাব্যচর্চায় এই পালাবদল সহজেই চোখে পড়ে। আর নতুন চেতনার উন্মেষে ইন্ধন যুগিয়েছে ভাষা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা' (কবিতা আমার শহিদ মিনার : ১৯৮৯ : ভূমিকা)।

নানা দৃক্‌কোণ থেকে এভাবে আলো ফেলে লক্ষ্য করা যায় যে, ষাট দশকের পরবর্তী সময়ে, বিশেষত আশির দশক থেকে যুগচেতনা বরাকের কবিদের সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। উনিশ তাঁদের শক্তি যুগিয়েছে, বরাকের কাব্য-সাহিত্যচর্চাকে বেগবান করেছে। শব্দের মালায় তাঁরা উনিশের চেতনাকে বেঁধে দিয়েছিলেন। আশির দশক থেকেই এখানকার বাংলা কবিতা ভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে। ঐতিহাসিক বাঁক পরিবর্তনের এই বিশেষ তাৎপর্যেই এই পর্বের সাহিত্য পৃথক মূল্যায়নের দাবি রাখে। ◆

শহিদ স্মারক

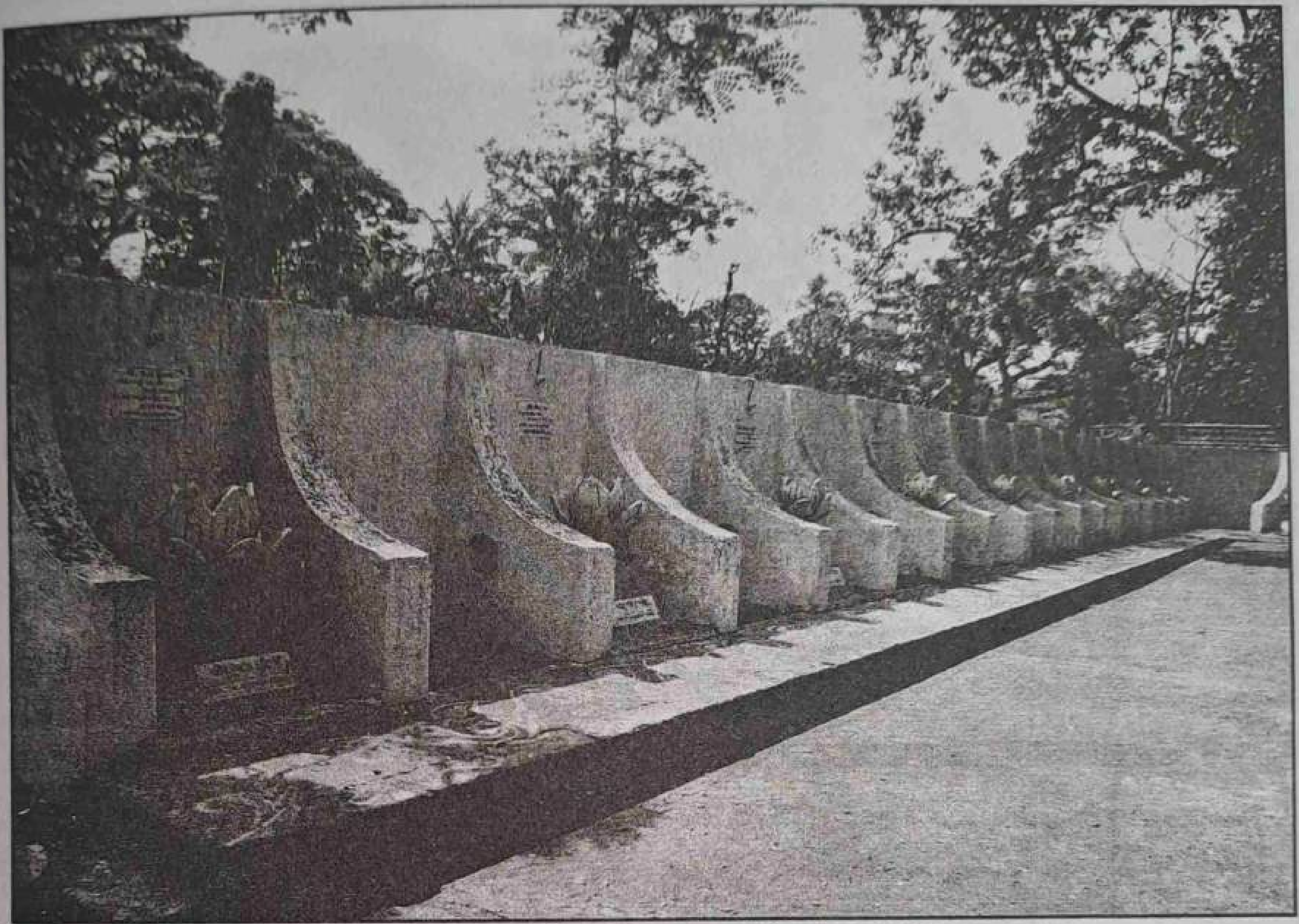

● শিলচর শ্মশানঘাট

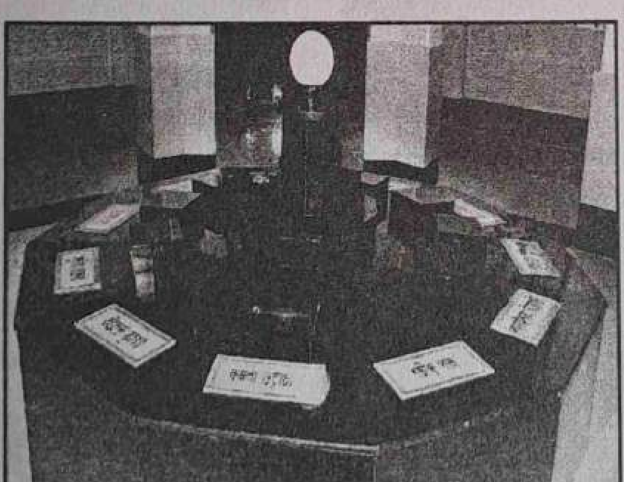

● শিলচর গান্ধীবাগ শহিদ স্মৃতি সৌধের অভ্যন্তর

● শিলচর রেলস্টেশন

শহিদ স্মারক

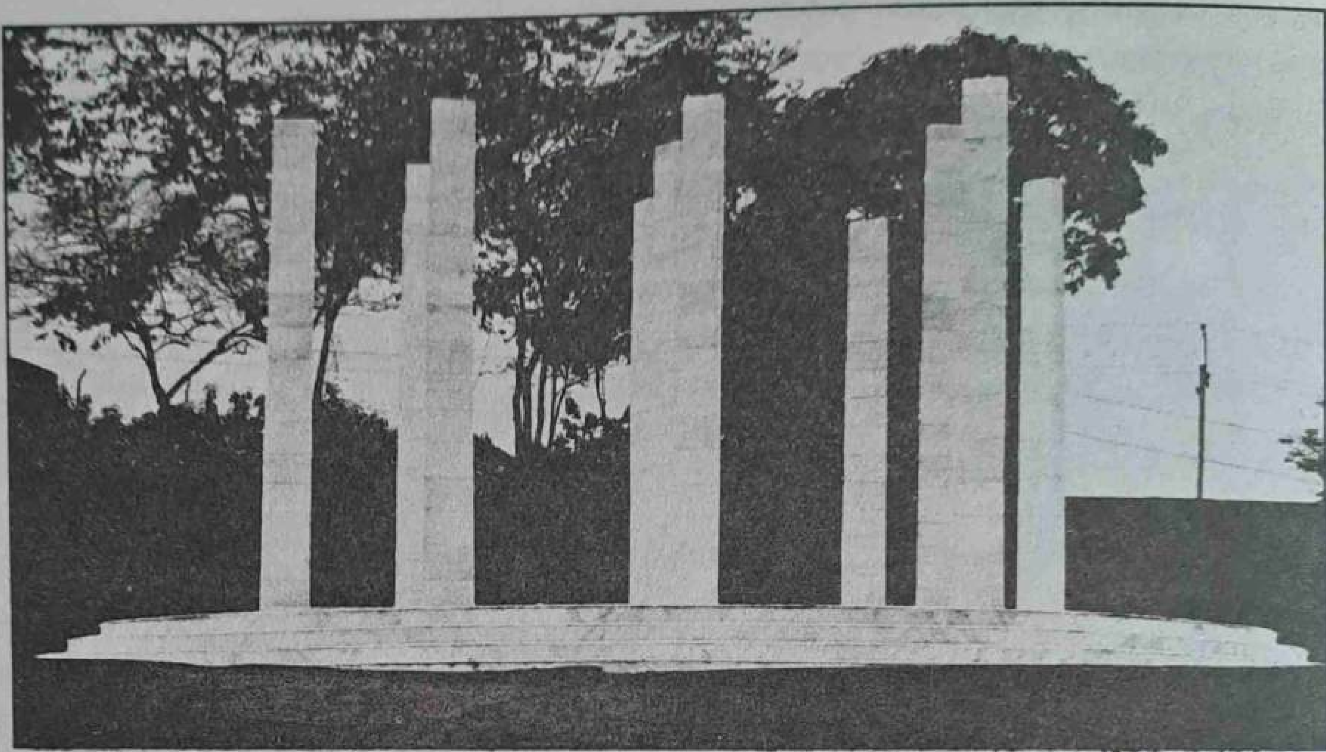

● আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

● করিমগঞ্জ শম্ভুসাগর পার্ক

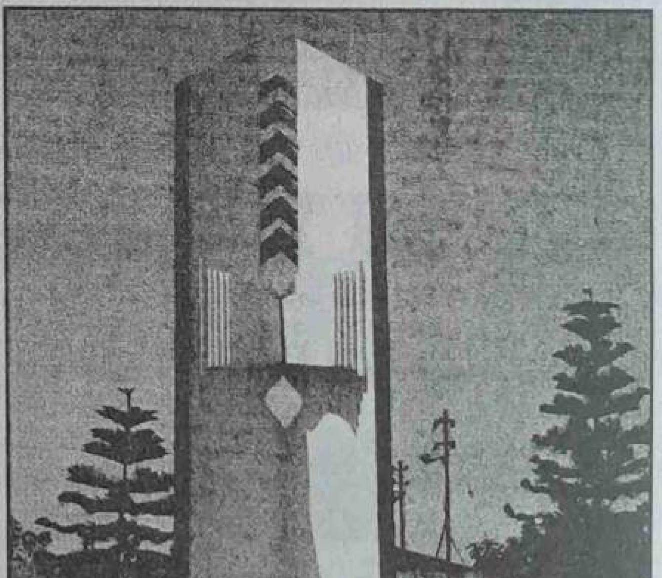

● হাইলাকান্দি একাদশ শহিদ সরণি

পরিশিষ্ট-৯

কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ ও দিল্লির দরবার

অবিভক্ত কাছাড়ের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক প্রয়াত বিধুভূষণ চৌধুরী কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ-প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলোচনায় দিল্লি গিয়েছিলেন। ওই সফর সম্পর্কে পরে তিনি যে প্রতিবেদন তৈরি করেন তাতে তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটি অপরিবর্তিত রূপেই এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনাটি ১৯৬১ সালের ২১শে জুলাই, ২৮শে জুলাই, ৪ঠা আগস্ট, ১১ই আগস্ট ও ২৫শে আগস্ট সাপ্তাহিক যুগশক্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দলের সহিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে সংবাদপত্রাদিতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দুয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে, পক্ষান্তরে কোন কোন মহল হইতে দুরভিসন্ধিমূলক এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারের চেষ্টাও হইয়াছে এবং হইতেছে দেখিয়া এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদল (কাছাড় কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিনিধিও) দিল্লি যাওয়ার পথে গত ২৭শে জুন ('৬১ ইং) অপরাহ্নে কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং এ পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভাষা সমস্যা সম্পর্কে প্রায় ২ ঘণ্টা আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী অশোক সেন এবং উপমন্ত্রী শ্রীঅনিল চন্দও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা অভিপ্রায় অনুসারেই এই আলোচনার ব্যবস্থা হয় বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। শ্রীসেন ও শ্রীচন্দ মুখ্যতঃ শাস্ত্রীসূত্রের সমর্থনেই যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেন। পরন্তু ডাঃ রায় সমগ্র সমস্যাটিকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একদিকে যেমন প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের স্বীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের ও পরিপূর্ণ বিকাশলাভের সুযোগ সুবিধা দানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সংবিধানের এতৎসম্পর্কিত নির্দেশাদির ত্রুটিবিচ্যুতি ও কোন কোন রাজ্য সরকারের সঙ্কীর্ণ মনোভাবের উল্লেখ করিয়া বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়বাসী তথা আসামের বাঙালি ও অন্যান্য অনসমীয়াভাষীদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সর্বভারতীয় ভাষা সমস্যা সম্পর্কিত তাঁহার প্রস্তাব বা সমাধানসূত্র (Roy

Formula) নিয়াও আলোচনা করেন। ডাঃ রায় সমগ্র বিষয়টি নিয়া এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করেন যে কাছাড় প্রতিনিধিদল তাহা হইতে অনেক চিন্তার খোরাক পান।

শ্রী অশোক সেনের সহিত পরদিন (২৮শে জুন) পুনরায় কলিকাতায় এবং পরে নয়াদিল্লিতে ৩০শে জুন ও ১লা জুলাই কয়েকবার তাঁহার বাসভবনে আলাপ-আলোচনা হয়, কিন্তু মূল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। তবে শ্রীসেন ব্যক্তিগতভাবে অভিমত প্রকাশ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৬ ইং মেমোরেন্ডামে র (ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণ সম্পর্কিত) সুপারিশ সমূহ সংশ্লিষ্ট রাজ্য কর্তৃপক্ষ মারফত কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে তিনি পদত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ১লা জলাই শ্রীসেন অস্ট্রেলিয়া রওয়ানা হইয়া যান। ডাঃ রায়ও ইতিমধ্যে বিলাত চলিয়া যান।

দিল্লিতে সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ ও তাহার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এই বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ভারত সমাচার দর্পণ' শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়ঃ

"......... সারা ভারতের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাগুলির জুলাই মাসের ফাইলের পাতা নাড়াচাড়া করে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে সম্প্রতি কাছাড় প্রতিনিধি দল যখন নয়াদিল্লী গিয়েছিলেন তখন সারা ভারতের দৃষ্টি তাঁদের প্রতি নিবন্ধ ছিল ......"।

কাছাড় প্রতিনিধিদলের মনোভাব সম্পর্কে 'হিন্দু'র (মাদ্রাজ) নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, 'ভারত সরকার তাঁদের (কাছাড় প্রতিনিধি দলের) দাবি সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করেছেন বলে তাঁরা আনন্দিত। কিন্তু আসাম সরকারের প্রতি তাঁদের এতটুকুও আস্থা নেই।'

কাছাড় প্রতিনিধিদল ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে আলোচনার ফলাফল ৫ই জুলাই তারিখে প্রায় প্রতি কাগজে প্রধান (লীড) অথবা দ্বিতীয় প্রধান (সেকেন্ড লীড) সংবাদের মর্যাদা পেয়েছে। (দিল্লি, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, কাশী, পাটনা, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর তথা ভারতের সর্বত্র প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য)।

'নাগপুর টাইমস'-এর মতে, প্রতিনিধি দল ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ত : তাঁরা বাংলা ভাষার মূল দাবি পরিত্যাগ করেননি। তৃতীয়ত: তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে একটি তথ্যবহুল স্মারকলিপি দিয়ে এসেছেন। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, আসাম সরকার অসমিয়া-করণের একটি আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করেছেন। শাস্ত্রী ফরমূলা কার্যকর করা সম্পর্কে আসাম সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কেও স্মারকলিপিতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

"ডেকান হেরাল্ড-এর (বাঙ্গালোর) মতে দিল্লি আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। 'ট্রিবিউন-এর (আম্বালা) সম্পাদকীয় (ডেল্লি টকস) অভিমত অনুসারে আলোচনায় কিছু সুফল হয়েছে। তাঁরা আরও বলেছেন যে, এই আলোচনায় অন্যতম তাৎপর্যমণ্ডিত ফল হল এই যে, ভাষাগত ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয়স্তরে যে রক্ষাকবচ রচিত হয়েছিল সেটি কার্যকর হওয়া যে কতটা জরুরি সে বিষয়ে প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেতন করতে পেরেছেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারত-সমাচার দর্পণ' প্রবন্ধে যেখানে বলা হইয়াছে- 'কাছাড়ের প্রতিনিধিদল যখন নয়াদিল্লি গিয়েছিলেন তখন সারা ভারতের দৃষ্টি তাঁদের প্রতি নিবদ্ধ ছিল'- তার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয়- 'দৃষ্টি নিশ্চয়ই। সহানুভূতি, হ্যাঁ, কিছু পরিমাণ। কিন্তু সুস্পষ্ট সমর্থন, বোধহয় না। এক্ষেত্রে কিন্তু পত্রিকাগুলিকে দোষ দেওয়া যাবে না। মনে হয় যে, কাছাড় প্রতিনিধিদল যদি আসামের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সব তথ্য বিবরণ যথা সময়ে সংবাদপত্রগুলির কাছে পাঠাতেন তাহলে তাদের জোর সমর্থন লাভ করতে পারতেন।'

এই বিষয়ে সংগ্রাম পরিষদের ত্রুটি স্বীকার করিয়াও একথা বলা যাইতে পারে যে, কাছাড় তথা আসামের বাঙালিদের সমস্যাদি সম্পর্কে দিল্লি বা ভারতের অন্যান্য স্থানের সংবাদপত্র ও জননেতৃবৃন্দ যে প্রায় কিছুই জানেন

না (বরং আসাম সরকার ও অসম সাহিত্য সভা ইত্যাদির নিয়মিত অপপ্রচারের ফলে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও প্রতিকূল ধারণাই অনেকক্ষেত্রে বর্তমান), তাহার কারণ বাহিরে কোনরূপ প্রচারের ব্যবস্থাই আমাদের নাই; এবং লোকসভা বা রাজ্যসভায়ও আমাদের এমন কোন সুযোগ্য প্রতিনিধি নাই, যিনি বা যাহারা আসামের বাঙালিদের প্রকৃত অবস্থার প্রতি সর্বভারতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। বহু ভাষাভাষী আসাম রাজ্যে বাঙালি ও খণ্ডজাতীয় অধিবাসীদের সংখ্যা যে অসমীয়াদের চেয়েও কম নহে এবং আসামের অধিকাংশ বাঙালিই যে এখানকার স্থায়ী অধিবাসী — ইহা অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। তাহা ছাড়া যে কারণেই হউক বহুস্থলেই বাঙালির বিরুদ্ধে একটা বদ্ধমূল বিরূপ মনোভাব বিদ্যমান দেখা যায়।

এই সব কারণেই আমাদের ন্যায্য দাবি সম্পর্কেও কিরূপ বিভ্রান্তিকর ও অযৌক্তিক সমালোচনা হইতে পারে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিল্লির প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'হিন্দুস্থান টাইমস' এর ৪ঠা জুলাই '৬১ ইং (মফস্বল সংখ্যা ৫ই জুলাই '৬১ ইং) তারিখের প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "The Militant Minority". সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দলের সহিত ২রা ও ৩রা জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার ঠিক পরেই এমন সব ভুল তথ্য ও একদেশদর্শী যুক্তির অবতারণা করিয়া এই সম্পাদকীয় লেখা হয় যে, সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে তৎপ্রতি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করেন এবং উক্তপত্রিকার অফিসে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎকারে তাহাদের ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করেন। সংগ্রাম পরিষদ সভাপতি ও সম্পাদকের নামে "Some common misconceptions about Assam–a clarification" শীর্ষক একটি বিবৃতি দেওয়া হইলে উহা উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত হয় এবং আসামের সব খবর জানিবার জন্য একজন বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে বলিয়া স্থির হয় (প্রস্তাবিত প্রতিনিধি ইতোমধ্যেই কাছাড় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন)। বিষয়টি নানা দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এখানে উল্লেখ করিলাম।

যাই হোক, এখন মূল বিষয় বস্তুতে ফিরিয়া আসা যাক।

সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধিদল ৩০শে জুন নয়াদিল্লিতে উপস্থিত হইয়া ঐদিন এবং তৎপরদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের সহিত মিলিত হন — ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীসেন কলিকাতায় যেসব কথা বলিয়াছিলেন, দিল্লিতে তাহারই অনুবৃত্তি করিলেও দুয়েকটি বিষয়ে একটু যেন অসামঞ্জস্য অনুভূত হয়। অবশ্য তৎসম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলার সময় এখনও আসে নাই।

২রা জুলাই পূর্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হইয়া ঘণ্টাখানেক চলিবার পর তাহা স্থগিত থাকে। শাস্ত্রীজির আচরণে ও কথাবার্তায় আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগ্রাম পরিষদ একমাসকাল অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইয়াছে— ইহাতে একদা গান্ধীজির অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামের নিষ্ঠাবান সেনানী শ্রীশাস্ত্রী বর্তমানে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হইয়াও প্রভাবিত হইয়াছেন মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

সংগ্রামপরিষদের আন্দোলন সম্পর্কে প্রথমে কিছু ভ্রান্ত ধারণা থাকিলেও পরে তিনি মোটামুটি সঠিক বিবরণ জানিতে পারেন। শ্রী শাস্ত্রীর শিলঙে অবস্থানকালে গত ৫ই জুন করিমগঞ্জ-শিলচর হইতে টেলিফোন যোগে তাঁহার সহিত যে সংগ্রাম বিরতি ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা কোন কারণে পরদিন (৬ই জুন) কার্যকরী না হইয়া দশদিন পরে (১৬ই জুন) কার্যে পরিণত হওয়ায় রাজনৈতিক বন্দীদের যে অনর্থক এই কয়দিন কারাবাসের কষ্টভোগ করিতে হইল,তজ্জন্য শাস্ত্রীজি নাকি কাছাড় কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। করিমগঞ্জ-শিলচর হইতে ৫ই জুন রাত্রে শিলঙে শাস্ত্রীজিকে জানাইবার জন্য টেলিফোনযোগে সর্বশেষে যে বার্তা প্রেরিত হয়, তাহা নাকি তাঁহার নিকট পৌঁছে নাই।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর সহিত সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধিদলের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার হয় ২রা জুলাই রাত্রি পৌনে দশ ঘটিকায় এবং এই বৈঠক রাত্রি পৌনে এক ঘটিকা পর্যন্ত চলে। ইহার পরই শাস্ত্রীজি আবার কাছাড় কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের সহিত আলোচনা করেন। মোটের উপর ঐ দিন প্রায় সারারাত্রি জাগিয়াই তিনি কাছাড়ের প্রতিনিধিদের সহিত মিলিয়া আসামের ভাষা সমস্যা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়া মাথা ঘামান। অথচ একদিন

পরেই নাকি তাঁহার পুত্রের বিবাহের তারিখ।

শ্রী শাস্ত্রী আসামের ভাষা সমস্যা নিয়া যে মহামুশকিলে পড়িয়াছেন তাহা তাঁহার কথাবার্তায় ফুটিয়া উঠে। বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা করার দাবি অযৌক্তিক নয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠে—অসমীয়াভাষীদের প্রবল বিরোধিতা কাটাইয়া উঠা যাইবে কিরূপ? চালিহা সরকারও যে বিরূপ।

কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বলিলে জবাব আসে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক দেশে কেন্দ্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রপতির শাসন হইলে তাহাও তো ছয়মাসের বেশি থাকে না; এরপর নির্বাচনে আরও খারাপ লোকের হাতে ক্ষমতা যাইতে পারে। তাহাতে লাভ হইবে কি?--- ইত্যাদি।

অগত্যা শাস্ত্রীজি অনুরোধ করেন, ধৈর্য্য ধর, আসামে সর্বত্র স্বাভাবিকঅবস্থা ফিরিয়া আসুক, এদিকে আমরা অন্য চেষ্টাও দেখি — সর্বভারতীয় স্তরে ভাষা সমস্যার একটা সমাধান-সূত্র বাহির করা যায় কি না। ডাঃ রায়ের ফর্মুলা বিবেচনা করা হইবে। শ্রী শাস্ত্রী আসন্ন মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন ও পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের (Eastern Zonal Council) অধিবেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

শ্রীশাস্ত্রী প্রসঙ্গক্রমে কাছাড়ের এই আন্দোলনকে গান্ধীজির অসহযোগ (১৯২১ ইং) আন্দোলনের সহিত তুলনা করেন। তবে তিনি এই মন্তব্যও করেন যে, স্বাধীন ভারতে এরূপ আন্দোলন হয়ত আবশ্যক ছিল না। শাস্ত্রীজিকে তখন স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে, নিয়মতান্ত্রিক পথে সমস্ত আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হওয়ার পরেই আসামের বাঙালিও অনসমীয়া ভাষিদের ন্যায্য দাবি দাওয়া সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে, ৫।২।৬১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলা গণ -সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী যথাসময়ে সকলকে (কেন্দ্রীয় সরকারকেও) জানাইয়া ১৯।৫।৬১ ইং তারিখে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, এবং প্রথম দিনেই ১০টি তরুণ ও ১টি তরুণীর অমূল্য জীবন বলি দিতে হয়।

শাস্ত্রীজি বিষণ্ণবদনে বলেন, শুধু তাই নয়, যাহারা আহত হইয়া হাসপাতালে আছে দেখিয়াছি, তাহারাও অনেকে একেবারে পঙ্গু হইয়া যাইতে পারে।

সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধি তখন বলেন, এত করিয়াও যদি আসামে আমাদের মাতৃভাষার দাবি স্বীকৃত না হয়, তবে পুনরায় তীব্রতর আন্দোলন করিতে হইবে বৈকি। তবে তখন শুধু কাছাড়ে নয়, শিলঙে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও তাহা ব্যাপ্ত হইবে এবং প্রয়োজন হইলে আরও বহু জীবন বলি দেওয়া হইবে।

শ্রীশাস্ত্রী তখন বলেন যে, এরূপ হইলে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিবেন।

সংগ্রাম পরিষদের প্রধান দাবি (আসামে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষারূপে স্বীকৃতি দান) আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ন্যূনকল্পে আর কী কী পাইলে সংগ্রাম পরিষদ তথা কাছাড়বাসী আপাততঃ তুষ্ট হইতেপারে, তাহা শ্রী শাস্ত্রীর অনুরোধে জানাইলে পরে দেখা গেল যে, শাস্ত্রীজি আসাম সরকারকে কিছুতেই মানাইতে পারিতেছেন না। এমনকি 'শাস্ত্রী ফরমুলা' আসামে কার্যকরী করা সম্পর্কেও ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কোন নিশ্চয়তা দান করা সম্ভব হইতেছে না। অবশ্য শ্রীশাস্ত্রীজি বলিলেন,যে তিনি এখানেই থামিবেন না, একটা সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

শাস্ত্রীজিকে সুযোগদানের জন্য তখন সংগ্রাম পরিষদ ৩মাস আন্দোলন স্থগিত রাখিতে সম্মত হন। শাস্ত্রীজি বলেন, ৩ মাস সময় যথেষ্ট নহে।

গত ৩রা জুলাই বেলা ১১টার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার হয়। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইয়া যায় এবং বারান্দায় দাঁড়াইয়াই কিছুক্ষণ আলাপ হয়। শ্রীশাস্ত্রীজি বলেন যে, শ্রীনেহরুর সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে এবং পরিষদ বক্তব্য ধীরভাবে শ্রবণ করিবার জন্য তিনি তাহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। নেতাদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়াও শ্রী শাস্ত্রী প্রকাশ করেন। সংগ্রাম বিরতি সম্পর্কে পুনরায় শ্রীশাস্ত্রী অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রীর সহিত প্রায় ৭০মিনিট ব্যাপিয়া আলোচনাকালে সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধিরই অধিককাল কথা বলিবার সুযোগ হয় এবং বিতর্ক প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুকে অনেকটা কোণঠাসা করিতে সমর্থ হন। ইহার কারণ শ্রীনেহরু ৩০শে জুন (৬১ ইং) তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনে আসাম, ভাষা সমস্যা, পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ, কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ, হাইলাকান্দি ইত্যাদি বিষয়ে এমন কতকগুলি উক্তি করেন যাহা বাস্তবের সহিত প্রায় সম্পর্কশূন্য এবং এইসব বিষয়েই যখন একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত করা হয় তখন শ্রীনেহরু অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন।

শ্রীনেহরুর সহিত এই আলোচনায় একটি জিনিস বেদনার সহিত লক্ষ্য করিলাম যে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও ভাসা ভাসা ধারণা হইতেই অভিমত প্রকাশ বা গঠন করেন এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভের চিন্তা তাঁহাকেও বিশেষভাবে পাইয়া বসিয়াছে।

কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আসাম রাজ্যে একমাত্র অসমিয়াকে রাজ্যভাষা করার অযৌক্তিকতা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া নেন এবং বাঙলাকে অন্যতম রাজ্যভাষা করিতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই — ইহাও বলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৬ ইং ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের মেমোরেন্ডামের অন্যতম প্রধান নির্দেশ (রাজ্যের শতকরা ৭০ভাগ এলাকা এক ভাষাভাষী হইলেই উহাকে একক সরকারি ভাষা করার নীতি) উপেক্ষা করিয়া অন্যায়ভাবে আসামে একমাত্র অসমীয়াকে রাজ্যভাষা করা হইল কেন এবং উহার আশু প্রতিবিধানের জন্য কী করা যায় — এইসব প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি সংবিধান, গণতন্ত্র ইত্যাদির দোহাই দিয়া বিষয়টি এড়াইয়া যান। পরন্তু সংবিধানের ৩৪৭ ধারা সম্পর্কে এমন মনোভাব দেখা যায়, যাহাতে গণতন্ত্র ও সংবিধানের উদ্ভট ব্যাখ্যা মানিয়া নিতে হয়। আসামের বর্তমান মন্ত্রিসভার কুশাসনের হাত হইতে রাজ্যবাসীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ তথা রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনায়ও প্রধানমন্ত্রীর একইরূপ চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রাদি সম্বন্ধে শ্রীনেহরু অহেতুক এমন সব রূঢ় মন্তব্য করেন যাহা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত অশোভনও অসঙ্গত মনে হইয়াছে।

আসামে পাকিস্তানীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দার্শনিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলে সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধিদল বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশেন করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে পরিণাম ভয়াবহ হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। শ্রীনেহরু অবশেষে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এখন দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা শেষ করিয়া প্রতিনিধিদল বাহিরে আসিতেই কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ (যিনি পূর্বাপর বৈঠকেউপস্থিত ছিলেন) আসিয়া বলেন যে, খুব চমৎকারভাবে সব বিষয় বলা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদলের সহিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এবং প্রধানমন্ত্রীর এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের সেক্রেটারি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ সর্বক্ষণ (২রা জুলাই প্রায় সারারাত্রি) প্রসন্ন মনে সাহায্য দান করেন।

দিল্লিতে অবস্থিত স্থানীয় ও সর্বভারতীয় প্রথম শ্রেণীর সব পত্রিকা এবং সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বিশেষ প্রতিনিধিগণ কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দলের সহিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর আলোচনাকে এত গুরুত্ব দান করেন যে, দুদিন প্রায় আহার নিদ্রা বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া তাঁহারা সরকারি দপ্তর ও সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধিদলের আবাসস্থল আগ্রা হোটেল ও নয়াদিল্লি কালীবাড়ির অতিথিশালায় দৌড়াদৌড়ি করেন। সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধিগণকে অনেক সময় নিজেদের মোটর গাড়ি দিয়া এবং বিবৃতি ইত্যাদি রচনা ও টাইপ করার ব্যাপারেও সাহায্য করেন। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহার ও নিরলস কর্মতৎপরতা ভুলিবার নহে। ◆

পরিশিষ্ট-২

এন সি চ্যাটার্জি বেসরকারি তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন

১৯শে মে'র নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের বেসরকারি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এন সি চ্যাটার্জির সভাপতিত্বে ছয় সদস্য নিয়ে গঠিত এই তদন্ত কমিশন তাঁদের রিপোর্টে কাছাড়ে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের অহেতুক নির্মম অত্যাচারের এক রোমহর্ষক চিত্র তুলে ধরেছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করতে গিয়ে চ্যাটার্জি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অহিংস শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দিক থেকে কাছাড়বাসীর এই আন্দোলন সারা ভারতের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বিশেষ করে নারী সত্যাগ্রহীদের দুর্জয় সাহস, পুলিশি বর্বরতার সামনে আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, ত্যাগ, লাঞ্ছনা ও দুঃখবরণের ঘটনাবলির প্রতি তিনি অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পুলিশি সন্ত্রাসের তীব্রতা ও নিষ্ঠুরতা করিমগঞ্জের ক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ। তাদের হিংস্রতা করিমগঞ্জ কিংবা শিলচর উভয়ক্ষেত্রেই মা বোনদের গায়ের কাপড় কেড়ে নিতে, তলপেটে লাথি মারতে এতটুকুও নিরস্ত হয়নি। শিলচরের গুলি চালনার মত মর্মন্তুদ ঘটনার নিন্দা করার মতো কোন ভাষা নেই। তিনি তদন্ত পরিচালনায় এও দেখিয়েছেন যে, আন্দোলনকে নিঃশেষ করে দিতে স্বার্থান্বেষী মহল সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির জন্যও তৎপর ছিল।

তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন :

১) আমাদের সামনে পেশ করা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আমরা নিশ্চিত যে, কাছাড়ের জনসাধারণ পরিচালিত আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল এবং মারাত্মক ধরনের উস্কানি সত্ত্বেও তারা ছিল অহিংসার নীতিতে অবিচল। সত্যাগ্রহীরা নিজেদের দাবির প্রতি সনিষ্ঠ এবং যথেষ্ট সংযমী ছিল এবং মহিলা সত্যাগ্রহীদের উপর সশস্ত্র পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের সময় স্বল্প সময়ের জন্য দু'একটি ইট পাটকেল ছোঁড়ার ঘটনা ছাড়া জনসাধারণ সংযত এবং নিয়মানুবর্তী হয়েই আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে সত্যাগ্রহী অথবা কাছাড়ের সাধারণ মানুষের দ্বারা এমন কোনও শান্তির ব্যাঘ্যাত ঘটানো হয়নি যা আসাম সরকার বা কাছাড় জেলায় নিযুক্ত তার এজেন্সিগুলির হিংসাত্মক কার্যকলাপকে সমর্থন করে। বরঞ্চ ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তি ভঙ্গের একটা প্রচেষ্টা কাছাড় জেলা কর্তৃপক্ষই করেছেন সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা

প্রশাসনের দ্বারা,সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র পুলিশের রুট মার্চ এবং হিংসার আবহাওয়া সৃষ্টি মাধ্যমে। আমরা নিশ্চিত যে, প্রশাসন সেনাবাহিনী, সি আর পি, আসাম রাইফেলস এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকারের এই সশস্ত্র ক্ষমতা প্রদর্শন সাধারণ মানুষের উপর বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তাদের মনোবল বাড়িয়ে তোলে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের প্রতি সিদ্ধান্তের সমর্থন সংগ্রামীদের মনোভাবকে দৃঢ় করে তোলে। সাক্ষ্য প্রমাণের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হয়নি। বরঞ্চ আসামে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতি গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার এই সংগ্রামের মূল আহ্বানকে অভিনন্দিত করা প্রয়োজন।

২) সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দ্বিধাহীনভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে আন্দোলন শুরু হবার অনেক আগে সেনাবাহিনীকে তৈরি রাখার সিদ্ধান্ত অপ্রয়োজনীয় ছিল। এই সিদ্ধান্তপরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো ছিলই না, এমনকি আইনানুগতও নয়।

৩) রাজ্যের এক বিশাল সংখ্যক মানুষের মুখের ভাষাকে রাজ্যিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং কোন সরকারের অধিকার নেই এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে যতক্ষণ পর্যন্ত তা শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস থাকবে, ততক্ষণ তাকে হিংসাত্মক উপায়ে দমন করা । সম্পত্তি ধ্বংস বা সাধারণ মানুষের উপর বলপ্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে কাছাড়ের জনগণ কোনরকম হিংসাত্মক আক্রমণের পরিচয় দেয়নি। এই আন্দোলন দমন করার জন্য আসাম সরকারের এই ধরনের বলপ্রয়োগের কোন প্রয়োজনই ছিল না। যদি ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়র মতে নির্ধারিত ১৪৪ ধারা বিধি ভঙ্গ করার অবাধ্যতা পরিলক্ষিত হত তাহলে সে ক্ষেত্রেও আইনের মাধ্যমই দুষ্কৃতিদের শাস্তিবিধান সম্ভব ছিল। বেআইনি সমালোচনা, সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার প্রয়োজন দেখা দিলে দেশের আইনবিধিই তার মোকাবিলায় প্রশাসনিক রীতিপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যে সকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শিলচরের সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি, গুলি ও টিয়ার গ্যাস চালনার জন্য দায়ি, তারা নিজেরাই কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়র এবং পুলিশ অ্যাক্টস অ্যান্ড রেগুলেশনকে ভঙ্গ করেন। সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে তখনই মিলিটারি এবং সশস্ত্রবাহিনী তলব করা যুক্তিযুক্ত হয় যখন কোন বেআইনি সমাবেশ দ্বারা সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আইন এটাই লক্ষ্য রাখে যে একজন সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান যাতে জনতা এবং জনগণের সম্পত্তি রক্ষার্থে ন্যূনতম বলপ্রয়োগের দ্বারা বেআইনি সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করেন বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেফতার করেন।

৪) আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে এবং যে সমস্ত স্থান আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা আমরা নিশ্চিত যে গুলিচালনা সহ পুলিশের সব কার্যকলাপই অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্গত ছিল। আমরা নিশ্চিত যে, শিলচরে গুলি চালিয়ে দশজন ব্যক্তিকে হত্যা করা, নির্বিচারে লাঠি ও বুলেটে বিধ্বস্ত করা সাধারণ জনতার উপর এবং পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়িগুলিতে অমানবিক অত্যাচার, লাঠি ও ঘুষি দ্বারা পুরুষ, নারী ও শিশুদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে নির্বিচারে আঘাত, একটি শিশুকে পুকুরে নিক্ষেপ, শিলচর স্টেশনের নিকটবর্তী পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচার চেষ্টায় রত এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা, এই ঘটনাগুলির কোনটিই যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

৫) ভারতীয় পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনীর ম্যানুয়েলে একথা সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, যে কোন পরিস্থিতিতে সশস্ত্র পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনী নামানো যেতে পারে, এবং যখন আর জনতার নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা

করা কোন অবস্থায়ই সম্ভব হচ্ছে না এমন ভয়াবহ অন্তিম পরিস্থিতিতেই গুলিচালনা করা যায়। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিত যে গুলিচালানোর মত কোনও পরিস্থিতিই তখন উদ্ভূত হয়নি।

৬) আমরা নিশ্চিত যে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে দুই বাহিনী পুলিশ, যারা রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম এবং রেল লাইনে দাঁড়িয়েছিল কোন পূর্বতন হুঁশিয়ারি ছাড়াই এই অনাবশ্যক, দায়িত্বজ্ঞানহীন, গুলি ছুঁড়েছিল। যে সমস্ত সাধারণ লোক যারা সত্যাগ্রহীদের সেখানে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল তাদের উপর হঠাৎ গুলি চালানোর কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না।

৭) সরেজমিন তদন্তে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে গুলি চালানোর ফলে স্টেশনের সন্নিকটস্থ এবং দূরবর্তী বাড়িগুলির ফেন্সিং, দেয়াল এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উচ্চতায় গুলি ভেদ করে চলে গিয়েছিল। আমরা এও প্রমাণ পেয়েছি যে স্টেশন থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে ঘরের ভিতরে বারান্দা এমন কি ষোল ফুট উঁচু জলের ট্যাংকের উপর আশ্রয় গ্রহণকারী লোককেও হত্যা করা হয়েছিল। আমরা নিশ্চিত যে হাঁটুর উপরে এবং দেহের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গুলি করা হয়েছে এবং হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এই গুলিচালনা করা হয়েছে। এমন অনেক আহত লোককে সাক্ষী হিসাবে আমরা পেয়েছি যাদের পিঠের দিকে গুলি লেগেছিল। এবং এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, ঐ লোকগুলি ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল অথবা তারা বিন্দুমাত্রও প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি।

৮) দেখা যায় যে, সত্যাগ্রহীরা নিজেরাই গ্রেফতার বরণ করেছিলেন। সুতরাং গ্রেফতার করার জন্য কিংবা তাঁদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কোন প্রকার বলপ্রয়োগই প্রয়োজনীয় ছিল না।

৯) একটি শিশুকে কয়েকজন পুলিশকর্মী একটি পুকুরে নিক্ষেপ করে এবং যারা তাদেরকে ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে যায় তারাই নিগৃহীত হয়। শিলচর ও করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ঘরবাড়ির ভেতরেও পুলিশ প্রবেশ করে, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি চুরমার করে ফেলে।

১১) আমরা যতদূর জানি ঐ সময় একজন ম্যাজিস্ট্রেট স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু দেখা যায় যে গুলি চালানোর জন্য তাঁর কোন সম্মতি বা নির্দেশ নেওয়া হয়নি। আমরা শিলচরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বক্তব্য পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, আসাম সরকারের দুটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং সমতল বিভাগের কমিশনার মিঃ বি সেনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি এ সমস্ত কিছু অনুসরণ ও অনুধাবন করে এক বিরাট অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছি। ঐ বিজ্ঞপ্তিগুলির মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান যে দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে এবং আসাম সরকারের উচ্চতর পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের অপকর্মকে আড়াল করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। নিজেদের দায়িত্ব থেকে সাময়িক ছুটি কিংবা স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ১৯ মে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে গুলি চালানো অপ্রয়োজনীয়, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অসঙ্গত ছিল।

১২) আমরা নিশ্চিত যে, ঐদিন পুলিশ কর্তৃক জনসাধারণ কিংবা পুলিশের আত্মরক্ষা করা কোন কিছুরই প্রয়োজন দেখা দেয়নি, এমন কিছুই বিপন্ন হয়নি যার জন্য গুলি চালাতে হয় এবং এক মহৎ প্রেরণার বশবর্তী হয়েই অফিসারের আদেশ ছাড়াই সশস্ত্রবাহিনী গুলি চালায়।

১৩) আমরা নিশ্চিত যে কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে আসাম রাইফেলস অথবা পুলিশ ফোর্স যেভাবে লাঠি ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করেছে, সাধারণ নিরস্ত্র শান্ত সত্যাগ্রহীদের উপর সেগুলি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং ঐদিন শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের ছত্রভঙ্গ করতে ঐ রকম বাহিনী প্রয়োগের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

১৪) আমরা দাবি করি যে, করিমগঞ্জে যে সমস্ত পুলিশ ও আসাম রাইফেল বাহিনী সত্যাগ্রহীদের দমন করার নামে সাধারণ মানুষের বাড়িঘর লুটপাট করেছে, বিনষ্ট করেছে, তারজন্য আসাম সরকার কর্তৃক তাদেরকে অভিযুক্ত করে আদালতেউপস্থিত করা উচিত। যদিও করিমগঞ্জে পুলিশ গুলি চালায়নি তবু সাধারণ নারী পুরুষদের উপর বিশেষত তরুণীদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত ব্যবহার কাছাড়ের অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা অধিক অমানবিক ছিল।

১৫) আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, চূড়ান্ত প্ররোচনা এবং আইনের রক্ষক, শান্তির বাহক (!!) পুলিশের বর্বরোচিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে কাছাড়ের জনসাধারণ যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করেছে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভকে বর্বরভাবে প্রদর্শন করেনি।

১৬) আমরা স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অসমিয়া ভাষা প্রবর্তন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আসামের এক শ্রেণীর লোকের যে জাগরণ তাকে দমনের জন্য আসাম সরকারের যে ভূমিকা, তা শুধু ভাষিক সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকারের উপরই আঘাত নয়, মানবিক অধিকার ধুলিস্যাৎ করারও এ এক প্রক্রিয়া।

১৭) আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এটাই স্থিরীকৃত যে, প্রত্যেক কার্যনির্বাহকই আইনের বিশাল ক্ষমতার প্রতি বিশ্বস্ত হবেন এবং যখন আইন ব্যবহার করবেন তখন আসনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকবেন। আমরা নিশ্চিত যে, কাছাড় জেলার কার্যনির্বাহকরা ঐ সীমা এতদূর অতিক্রম করেছেন যে তাদের ভারতীয় আইন ভঙ্গকারী হিসাবে দায়ী করা যায়। আমরা আসাম সরকারকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

১৮) যাঁরা মারা গেছেন, যাঁরা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়েছেন, যাঁরা অন্তত কিছুদিন অবধি কর্মহীন থাকতে বাধ্য হয়েছেন, আমাদের মত এই যে তাঁদের যেন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

১৯) উপসংহারে আমরা John Locke এর কথারই প্রতিধ্বনি করছি—"Just and moderate Governments are everywhere quite, everywhere safe but oppression raises ferments and makes men struggle to cast off an weary and tyrannical yoke...There is only one thing which gathers people in seditions commotions and that is oppression."

নিজেকে প্রকাশের জন্য মানুষের মাতৃভাষার অধিকার মৌলিক মানবিক অধিকার। এই অধিকারকে অস্বীকার করা কিংবা দমনের মাধ্যমে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এর কোনটাই আসাম তথা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

স্বাক্ষরকারী :

এন. সি. চ্যাটার্জি (চেয়ারম্যান)
রণদেব চৌধুরী
অজিতকুমার দত্ত
এস. কে. আচার্যি
সিদ্ধার্থশংকর রায়।" ◆

পরিশিষ্ট-৩

Statement of Lal Bahadur Shastri

Union Home Minister, Shillong, June 6, 1961

I have been in Assam for about six days and both in Shillong and Silchar I met a large number of people with whom I was able to discuss the various aspects of the language question fully. This problem has created a special situation in this State and feelings have run high. It is absolutely essential that the existing misapprehensions and doubts should be dispelled. I know these could not vanish in a moment. However, a new psychology has to be created and certain positive steps have to be taken to demonstrate a spirit of accommodation both by the Assamese-speaking people and others. The special situation that has arisen in regard to Cachar has to be tackled immediately. Besides the language issue, the recent firing in Cachar has further aggravated the situation. In my discussions in Cachar a number of suggestions were, made and I have given full thought to them. On my return to Shillong from Silchar I discussed the various aspects of this problem both with the Chief Minister and the President of the Pradesh Congress Committee along with their colleagues. I am glad that certain proposals have emerged out of the discussions, which to my mind, are satisfactory not only for Cachar but for the whole of the State. The Chief Minister is issuing an official statement covering these points.

The proposals in a nut-shell are :

1. Assam Official Language Act may be amended to do away with the provision relating to Mahkuma Parishads.
2. Communications between State Headquarters and Cachar and the autonomous Hill Districts to continue in English until replaced by Hindi.
3. At State level English will continue to be used for the present. Later, English will continue to be used along with Assamese.
4. The linguistic minorities in the state will be accorded the safeguards contained in the Government of India's Memorandum dated September 19, 1956.
5. Clarification may issue that under the provisions of Art.348 (3) of the

Constitution all Acts, Bills, Ordinances, Regulations and orders, etc., will continue to be published in the Official Gazette in English, even where these are published in Assamese under the second provision to section 3 of the Official Language Act.

6. Some arrangements to be considered for effective implementation of development schemes at the District level
7. The Agitation in Cachar should be withdrawn.
8. The Assam Government may consider the release of all prisoners detained in connection with the movement, except those charged with crimes involving violence and sabotage, as soon as they are satisfied that the movement will not be resumed.

The most ticklish question has been that of amending the Bill in order to delete the provision made about Mohkuma Parishads in the Cachar area in Section 5 of the Official Language Act. However, I am glad that it has now been agreed to by the Executive of the Provincial Congress Committee and the Government.

The other points are equally important and have been unreservedly agreed to. It is now important that these proposals should be fully implemented and at the earliest. The officers of the State Government should carry out the orders of Government in the true spirit. The responsibility of the officers is great and they can with proper execution restore a new confidence and a new hope in the minds of the linguistic minorities of the State. It is essential that both the non-officials and officials should fight the disintegrating forces that are at work and the provincial, regional, communal or local feelings are subordinated to the larger interest of the people of India. It has also to be remembered that we cannot govern any state or the country merely by force and we must carry the people with us. The people have also to realize that no Government would be worth its name if it allows them or any section of the community to take the law into their own hands and become a menace to the peaceful functioning of society. A great restraint has to be exercised by the organizations or political parties, which may hold a particular, view or want certain grievances to be redressed. There are always deficiencies and shortcomings in a government and also long society exists, there will be demands and counter demands. What is important is that the leaders of the community and the people should adopt the right means so that a healthy influence is created. It is much more important as we are still in a nascent stage of our democracy. The kinds of struggles that have been launched in Assam during the last one-year have indeed produced a very bad result. The most unfortunate part of it has been the poisoning of the minds of the people, eradication of which will take some time. The responsibility of public leaders is therefore obvious and I would beg of them to think coolly over the matter and try to change the very psychology of the people.

It would be an unfortunate day if in any state different communities speaking different languages could not live together in peace and amity. Every state will have its official language. It should be the duty of all the people of that state, whatever their

mother tongue may be, to accept it sincerely and try to learn it quickly. It should equally be the responsibility of the Government and those who speak the official language to give all facilities for the use and growth of other languages, which are used, by a sizeable number of people living in the state.

Assam state has great potentiality for progress and development. It is backward in many respects no doubt; yet the next five years will bring about a considerable change in the present state of affairs in every region of this state. If regional rivalries on language and other matters will continue, they would retard the growth and progress of the people of the state.

The question of linguistic minorities concerns almost all the states in the country. I know that a little generosity in this regard mutually shown by the southern state between themselves has created a very wholesome effect. It is only this attitude, which will ultimately pay and produce the desired results. May I add a word of appeal to the citizens and the press of Calcutta who have been deeply affected by what has happened in Cachar? My request to them is that they should lend their full support to the various steps that are now being taken by the state government of Assam. I am sure they would fully help in restoring peace to the state. It is only mutual trust and a brotherly spirit that would help.

I do not know what the Sangram Parishad of Cachar will ultimately do. My advice to them was and even now is that they should call off their movement. They should give every opportunity for the implementation of these proposals in a calmer atmosphere. I earnestly hope that they would accept my advice. If the movement is not resumed, I am sure the State Government would consider releasing the prisoners immediately. This would undoubtedly create a healthy atmosphere in the district and help in restoring normalcy.

I must commend the spirit of the Nikhil Assam Bangla Bhasa Bhasi Samiti has shown in suspending their proposed observance of 'Demand Day'. I have no doubt that they would call off their proposed movement without any delay as any such movement would only have a very undesirable effect on the state as a whole.

I am grateful to Shri Chaliha and his colleagues as well as to Shri Siddhinath Sarma and other Congress friends for their continued help and support in my efforts. They have been good enough to show a spirit of accommodation. It would not have been possible for me to make any progress without their unstinted co-operation.

I am thankful to the Governor also who has in his own way, been making his quiet contribution.

The journalists of this state have also been exceedingly helpful and I have every hope that they will be good enough to maintain the same spirit and help in building up necessary public opinion in future. I go back to Delhi with the satisfaction that real and genuine efforts have been made to bring now up to the political parties, various organizations, the administration, the press and the people as a whole to translate them into action and give the right and proper lead. ◆

পরিশিষ্ট-৪

Statement of Bimala Prasad Chaliha

Chief Minister of Assam, Shillong, June 6, 1961

It is very unfortunate that the healthy climate of our peaceful state has been vitiated by the agitations over the Official Language issue. The great tragedy of 1960 and the recent happenings in the district of Cachar resulting in the unfortunate death of 11 persons leading to disruption of the normal life in the district, should be an eye-opener to all sections of people about the danger of agitational approach. The controversy over the Official Language issue has drawn the attention of no less important a person than the Prime Minister of India. His colleague, the Union Home Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, was kind enough to come and spend several days in our state to study this problem. He met many leading men of this state and also visited the district of Cachar. As a result of his study he has placed before us various suggestions for which we are grateful to him. We also have taken note of our Prime Minister's appeal for maintaining status quo for one year with a view to restore a peaceful atmosphere among the different communities in the state.

The Assam Official Language Act 1960 which provides for Assamese as the Official Language of the State, is based on two basic principles, namely, (1) Assamese will not be imposed in any of the non-Assamese speaking Districts,(2) no non-Assamese speaking people of the state would be made to suffer any disability for employment, service etc., because of his lack of knowledge of the Assamese Language. The Act, therefore, provides that the language in which the district administration would be run in the Autonomous districts would be decided by the District Councils of the respective Autonomous Districts and so far as the district of Cachar is concerned, Bengali Language has been provided as the language in which the district administration would be run until the Mahkuma Parishad and the

Municipal Board decide by a majority of two-thirds for a change to the Official Language.

In addition to Assamese, there is provision in the Act for English, and when it is replaced, Hindi for official purposes of the Secretariat and the Heads of the Departments.

Having taken into consideration the feeling in Cachar against the provision concerning Mahkuma Parishad in Section 5 of the Official Language Act, and the advice of the Prime Minister and the Union Home Minister, the government have decided to sponsor and amendment to the Act deleting this provision. This should allay the apprehension in the minds of Cachar people regarding the use of Bengali Language at district level in Cachar.

According to the provision of the Assam Official Language Act, Assamese along with English (and when English is replaced, Hindi) would be used for official purposes in the Secretariat and the Heads of the Departments. The official purposes for which they will be used will be prescribed by rules. The rules consistent with the basic principles of the Act will be so framed that the correspondence with Cachar and Autonomous District administrations from the Secretariat and the Heads of the Departments would be in English and when replaced, in Hindi.

As regards the second provisions to section 3 of the Assam Official Language Act, 1960, which lays down that all Ordinances, Acts, Bills, Orders, Regulations, etc., shall be published in the Official Gazette in the Assamese language, there is some misapprehensions that such publication will be done only in the Assamese Language and that an English or Hindi text would not be provided. Government would like to clarify that under the provisions of Article 348(3) of the Constitution where the State Legislature has prescribed the use of language other than English for official purposes, an English translation shall invariably be published in the Official Gazette under the authority of the Governor. Thus the Constitution itself provides for translation in the English language of all Ordinances, Acts, Bills, etc., and a provision to this effect in the Official Language Act, 1960 was unnecessary and would only have been redundant. Government hope that this clarification will allay any apprehensions entertained in this regard.

The Government in order to acquaint the people with important pieces of legislation and information have been distributing even now the translated version of important Acts, Notifications, etc., in some cases. Even though there is no provision in the statute for such arrangements, this will be continued in future as well.

Of the qualifications for recruitment to the Assam Civil Service and allied provincial posts, the knowledge of Assamese or Bengali or a tribal language of the state is essential. This is proposed to be continued even after the enforcement of the

Assam Official Language Act. There is no intention to make the knowledge of Assamese compulsory for recruitment to service. In this connection attention to provision (c) to Clause 7 of the Assam Official Language Act is also drawn.

So far as education is concerned it has been specifically mentioned in the body of the Act that the rights of the various linguistic groups in respect of medium of instruction in educational institutions as laid down in the Constitution of India shall not be affected. It has also been provided in the Act that no discrimination would be made in granting aid to educational and cultural institutions on grounds of language.

Some apprehensions have been expressed in respect of the difficulties faced by the minorities. In this connection, attention is invited to the Government of India's memorandum, dated September 19,1956, which is contained in Appendix I in the Third Report of the Commissioner for Linguistic Minorities. The safeguards mentioned in this Memorandum were devised by the Government of India in consultation with the Chief Ministers of States and have also been approved by Parliament. The Assam Government have already accepted this Memorandum and will implement the safeguards contained therein.

With regard to the proceedings of the Assam Legislative Assembly, these are governed by Article 210 of the Constitution. This Article provides for the use of the Official Language or Languages of the State, or Hindi, or English and it further empowers the speaker to permit any member who cannot express himself in any of the languages mentioned above, to address the House in his mother tongue. Under Article 350 of the Constitution, petitions can be submitted in any language used in the State, Replies from the State level to partitions received in languages other than Assamese will be sent in English or Hindi.

It is clear that the implementation in actual practice of the Official Language Act will be a measure involving considerable complexities. A scheme in some details will, therefore, have to be drawn up in such a way as to embody the basic principles enunciated above. In drawing up this scheme, we have approached sister states who have gone ahead of us in this matter to supply us with rules and regulations on their own schemes. The state government in the light of the above considerations will frame rules and take other relevant steps for implementing the Act.

The Union Home Minister in course of discussion with the leaders of Cachar expressed sympathy and support to help the development of the district as a handicapped and insular area due to partition. Government would welcome the Home Minister's efforts in this regard. In this connection, Government feels that many of the districts in the State are extremely backward in the matter of development. For financial and other handicaps it has not been possible to provide for uniform development all over the state. In fact, Assam itself as compared with many parts of

India is lagging behind in respect of such development. The Government are equally anxious, as are the people of different districts to bring about progress and development as speedily as possible. It is the intention of the government to request the Government of India to give special consideration and provide additional funds for development works for the under-developed districts. It is also the intention of the government to form suitable Boards or Committees in such under-developed areas to advise the Government for undertaking developmental projects.

The Government is happy that Nikhil Assam Banga Bhasa-Bhashi Samiti had decided on the advice of the Union Home Minister to defer the observance of the 'All Assam Demand Day' which was proposed for the 4th June. This is a valuable contribution to the maintenance of peace in the state and the government are hopeful that a similar spirit will prevail amongst the people of Cachar and their leaders. The government would appeal to them to call off the agitation and help in restoring normalcy to that district.

For their part, Government are willing to release prisoners detained in connection with the recent agitation except only those charged with crimes involving violence and sabotage. Government are prepared to take this steps as soon as they are satisfied that the movement will not be resumed.

Finally, I would like to convey to the people of Assam,+ that our state is passing through difficult times and in this crisis, the whole of India is watching us not merely to preserve peace and tranquility but to create and maintain condition which may lead to development of friendship and emotional integration amongst different elements constituting the state so that we may properly discharge the high duty of sentinel cast on us of guarding the eastern frontiers of India. I further hope that the people of Assam will accept this statement in a spirit of mutual co-operation, goodwill and toleration upon which only the difficult problem of language can be solved and democracy preserved in the country. ◆

পরিশিষ্ট-৫

শাস্ত্রী সূত্র, সরকারি প্রতিশ্রুতি ও তার প্রয়োগ

১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের, পরিচালক কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন করে আন্দোলন প্রত্যাহার (তখন বলা হয়েছিল স্থগিত করা) করতে রাজি হয়েছিলেন। শাস্ত্রী-সূত্র নামে পরিচিত ওই সমাধান-সূত্রে ঠিক কী ছিল সে সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা স্পষ্ট নয়। ১৯৬১ সালের ৬ জুন আসামের রাজধানী শিলং-এ তাঁর সমাধান-সূত্রটি এক বিবৃতির মাধ্যমে উপস্থিত করেছিলেন, তাতে যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাকেই শাস্ত্রীসূত্র বলা হয়। এই শাস্ত্রী সূত্র বাস্তবে কতটুকু প্রয়োগ হয়েছে সে বিষয়টি নিয়ে ঐতিহাসিক সুজিৎ চৌধুরী একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ —

লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর প্রস্তাবগুলি ছিল :--

১। The Assam Official language Act may be amended to do away with the provision relating to Mahakuma Parishad;

২। Communication between State headquarters and Cachar and the autonomous Hill Districts to continue in English until replaced by Hindi;

৩। At State level, English will continue to be used for the present. Later, English will continue to be used along with Assamese;

৪। The Linguistic minorities in the State will be accorded the safeguards contained in the government of India's memorandum dated Sept. 19,1956.

৫। Clarification may be issed that under the provisions of Art. 348 (3) of the constitution all Acts, Bills, Ordinaces Regulations and Orders, etc. will continue to be published in the published in the official Gazette in English, even where these are published in Assamese under the second provision to section 3 of the

Official Language Act.

৬। Some arrangements to be considered for effective implementation of development schemes at the District level.

পরে দিল্লিতে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনার পর এই প্রতিশ্রুতিগুলিই কার্যকর করার আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই অনুসারে ১৯৬১ সালের Assam Act No XVIII of 1961 অনুসারে মূল আইনে মহকুমা পরিষদ সম্পর্কে যে বিধি ছিল, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। মহকুমা পরিষদ সম্পর্কিত এই বোধ কী ছিল, তা একটু বলে নেওয়া দরকার, নইলে বিষয়টার গুরুত্ব বোঝা যাবে না। ১৯৬০ সালের ভাষা আইনে তৎকালীন কাছাড় জেলা অর্থাৎ বর্তমান বরাক উপত্যকার জন্য জেলা স্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু তার সঙ্গে একটা গোলমেলে ব্যাপার জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল কাছাড় জেলার মহকুমা পরিষদগুলি যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোটে স্থির করে যে বাংলার পরিবর্তে অন্য ভাষা ব্যবহার করবে, তবে বাংলা ভাষার বদলে সেই ভাষাই চলবে (.... by a majority of not than two-thirds of the members present and voting decide in favour of adoption of any other language...)। ব্যাপার হচ্ছে ভাষা সম্প্রসারণবাদীরা ব্যবস্থা রেখেছিলেন যাতে পরবর্তীকালে মহকুমা পরিষদগুলিকে হাত করে বরাক উপত্যকায় অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়া যায়।

তবে মহকুমা পরিষদকে ব্যবহার করে বরাক উপত্যকায় অসমিয়াকরণের যে ব্যবস্থা ১৯৬০ সালের ভাষা আইনে রাখা হয়েছিল, ১৯৬১ সালের আন্দোলনের ফলে সেই ব্যবস্থাটি আর রইল না, কারণ মহকুমা পরিষদ সংক্রান্ত ধারাটিই সংশোধন করে তুলে দেওয়া হল। এটা একটা বড় রকমের পদক্ষেপ, যার ফলে পরবর্তীকালের বহু ষড়যন্ত্রের জাল থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এখন ভাষা আইনের কাছাড় (অর্থাৎ বরাক উপত্যকা) সংক্রান্ত ধারাটির বয়ান দাঁড়িয়েছে এই রকম : Without prejudice to the provisions contained in Section 3, the Bengali language shall be used for administrative and official purpose upto including the district level in the district of Cachar (এখনকার বরাক উপত্যকা)।

শাস্ত্রী সূত্রে দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিটির প্রতিফলন ঘটেছে ১৯৭০ সালে প্রণীত The Assam Official Language Rules, 1970-তে যাতে রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে জেলা স্তরের যোগাযোগের ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে : All such communications with offices in the Autonomous Districts, Autonomous Region and Cachar shall be in English until replaced by Hindi as the official language of the Union. ঐ রুলের আরো দুটি বিধান হচ্ছে : (1) Replies to representations, petitions and communications from the Govt. at the District levels will be (a) in Assemese in the Brahmaputra Valley Districts, (b) in Bengali in the District of Cachar (বরাক উপত্যকা), and (c) in English in the Autonomous regions ইত্যাদি। অন্য বিধান (2) Replies from the State secretariat and Heads of Department, offices to representations, petitions and communications received in any language shall be sent in Assamese in the Brahmaputra Valley Districts and English in the District of Cachar and Autonomous Districts and Regions.

অসুবিধার ব্যাপার হচ্ছে যে, আন্দোলনের মাধ্যমে যে অধিকারগুলি আদায় করা সম্ভব হয়েছে এবং আইনের বিধানের মধ্যে যেগুলো সংস্থাপিত করা হয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে

আমরা অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা আদৌ সচেতন নই। দিশপুর যখন এই উপত্যকার সঙ্গে যোগাযোগ করে তখন ভাষা আইনের বাংলা বা ইংরেজি ভাষা সংক্রান্ত বিধানগুলির কথা আদৌ মনে রাখে না। এমন কি দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, সমস্ত ধরণের রাজনৈতিক দলগুলি পর্যন্ত অসমিয়া ভাষায় প্রকাশিত বিবৃতি, পুস্তিকা দেওয়ালপত্র এই উপত্যকায় অবলীলায় পাচার করে দেন। কর্মচারী সংস্থা বা অন্য সংগঠনগুলিও তাই করে থাকেন। রাজ্য বিধানসভায় বরাক উপত্যকার বিধায়করা এ নিয়ে সোচ্চার নন।

১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের সংগঠক কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ আরেকটা বড় দাবি তুলেছিলেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলাভাষীদের অধিকার সংরক্ষণ করার ব্যাপারে। সেইজন্য বলা হয়েছিল যে গোটা রাজ্যেই বাংলা ভাষাকে রাজ্যভাষার মর্যাদা দিতে হবে। যেহেতু এই ব্যাপারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বঙ্গভাষীরা কোনো আন্দোলন তেমন ভাবে গড়ে তোলেননি, তাই ঐ দাবি কার্যকর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ঐ উপত্যকায় এ নিয়ে আন্দোলন করা সম্ভবই ছিল না, করলে ব্যাপক দাঙ্গা করে বঙ্গভাষীদের সরাসরিই ধনেপ্রাণে শেষ করে দেওয়া হত। ১৯৬১ সালের আন্দোলনের সময়ে নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতি ১৯ মের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৪ জুন তারিখে শুধুমাত্র শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাতেই যে-পরিমাণ নিপীড়ন শুরু হয়েছিল, তাতে শেষ পর্যন্ত ঐ কর্মসূচি পর্যন্ত প্রত্যাহার করতে হয়। যাই হোক, তবুও সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনার ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের ন্যূনতম স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৫৬ সালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের স্মারকলিপি (Home Ministry Memorandum dated Sept. 19, 1956) আসামে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা ৬ জুন ১৯৬১ তারিখে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেই বিবৃতিতে তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন যে "Some apprehensions have been expressed in respect of the difficulties faced by the minorities. In this connection, attention is invited to the Government of India's Memorandum, dated September 19, 1956, which is contained in appendix-I in the Third Report of the Commissioner for linguistic Minorities ... The Assam Government have already accepted it." অর্থাৎ তিনি আসামের ভাষিক সংখ্যালঘুদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৬ সালের মেমোরেণ্ডামে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেগুলো আসাম সরকার গ্রহণ করেছেন। ঐ দিনই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তার সমাধান-সূত্র ঘোষণা করেন, তাঁরও চার নম্বর সূত্রে ছিল, "The linguistic minorities in the state will be accordd the safeguards contained in the Government of India's Memorandum dated September, 19, 1956." অর্থাৎ আসামের ভাষাগত সংখ্যালঘুরা ঐ মেমোরেণ্ডামে যে সুবিধাগুলোর কথা বলা হয়েছে, তা ভোগ করবেন। ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে দেশের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়েছিল, তাতেও ঐ মেমোরেণ্ডামের সূত্রগুলো মেনে চলার কথা বলা হয়েছিল।

এখন দেখা যাক ১৯৫৬ সালের ঐ মেমোরেণ্ডামে কী ছিল? এতে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিবিধ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। মেমোরেণ্ডামের ১১ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে "The Commission has further suggested that is districts or smaller areas like Municipalities and Tehsils where a linguistic minority in addition to any other languages in which such documents may otherwise be published in the usual course." অর্থাৎ সংখ্যালঘু ভাষা কমিশনের পরামর্শ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে যদি কোনো পৌর এলাকায় কিংবা গ্রামাঞ্চলের

ক্ষেত্রে তহশীল এলাকায় কোনো সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা ১৫ বা ২০ শতাংশ হয়, তবে রাজ্য সরকারের কর্তব্য হচ্ছে সেই সমস্ত এলাকার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি ও নিয়মকানুন অনুবাদ করে ঐ ভাষায় প্রকাশ করে বিতরণ করা। বলাবাহুল্য এই নির্দেশ অনুসারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সবগুলো শহরেই বাংলা ভাষায় সরকারি বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি ছাপার ব্যবস্থা করা দরকার। নগাঁও, দরং, ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, শোণিতপুর ইত্যাদি জেলার গ্রামাঞ্চলের বহু তহশীলেও সেই একই ব্যবস্থা নিতে হয়। চা বাগান এলাকাগুলিতে হিন্দি কিংবা সাঁওতালি ভাষায় প্রচারের ব্যবস্থা থাকাও দরকার। মিশিং, বোড়ো, ডিমাসা ইত্যাদি ভাষায়ও সরকারি নির্দেশাদির অনুবাদের প্রয়োজন হবে। আমাদের বরাক উপত্যকায়ও পাথারকান্দি অঞ্চলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, লক্ষীপুর অঞ্চলে মণিপুরী, বড়খলা অঞ্চলে ডিমাসা, বাগান অঞ্চলে হিন্দি ও সাঁওতালি ইত্যাদি ভাষার মাধ্যমে সরকারি নির্দেশাদি প্রচারিত হওয়া দরকার।

রাজ্য সরকারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়েই সরকারিভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,১৯৬৫ সালের মেমোরেণ্ডামের নির্দেশগুলো আসাম সরকার মেনে চলবেন, কিন্তু তা করা হয়নি, সরকারি প্রতিশ্রুতি যদি পরবর্তী সরকার রক্ষা না করেন, তবে জনসাধারণের আস্থা সরকারের উপর কমে যেতে বাধ্য। বলাবাহুল্য এই ধরণের আস্থাহীনতা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। ১৯৬১ সালের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা যাতে সরকার কাগজপত্র নিজেদের ভাষায় পেতে পারে তার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটা করে ট্রানশ্লেসন বোর্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমাদের রাজ্যে এত বছর পরও সে ধরণের কোনো বোর্ড গঠিত হয়নি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কথা বাদই দিলাম, বরাক উপত্যকায় পর্যন্ত সরকারি প্রচারপত্রাদি বাংলা ভাষায় পাঠানো হয় না, অন্য ছোট ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থা তো এতেই অনুমান করা যায়।

দেখা যাচ্ছে, আইনের মাধ্যমে এবং সরকারি প্রতিশ্রুতি দায়বদ্ধতায় যে অধিকারগুলি সংরক্ষিত, সেগুলোও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো মর্যাদা পাচ্ছে না। এ জন্য আসাম সরকারকে দোষারোপ করা যায় নিশ্চিতই, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব তাতেই শেষ হয়ে যায় না। স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন যে এই শতকের ষাটের বা সত্তরের দশকে আমরা ভাষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার সম্পর্কে যতখানি সচেতন ছিলাম, এখন আর ততখানি সচেতন নই। এবং এই দুইটি অধিকার সম্পর্কে সচেতন না থাকার দরুণ আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারও সংরক্ষিত করা যাচ্ছে না। কারণ শুধুমাত্র ভাষিক পরিচয়ের জন্যই আমাদের বঞ্চনা করার সুযোগ ও সাহস রাজ্য সরকার পেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের ভাষা আন্দোলনের একটা ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু তার উত্তরাধিকার অনেকখানিই দুর্বল হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে সে আন্দোলন কোনো সাহায্য পাচ্ছে না।

এখনকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়েও পার পেয়ে যাচ্ছেন, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই, যে- শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই ধরণের প্রশ্ন নিয়ে জনমত গড়ে তোলার কাজটা সর্বত্র করে থাকেন বরাক উপত্যকায় বর্তমানে ঐ শ্রেণী অধিকাংশ সময়েই দায়িত্ব পরিহার করে চলেন। কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাময়িকীর পাতা এবং বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কর্মকাণ্ড ছাড়া অন্যত্র ভাষার দাবির ব্যাপারটা আসেই না। ◆

পরিশিষ্ট-৬

আসাম ভাষা আইনে বরাকের প্রাসঙ্গিক অংশ

আসাম সরকারি ভাষা আইনে বরাক উপত্যকার জন্য প্রাসঙ্গিক যে বিধানগুলি রয়েছে তা হল :—

ক। **Section 5. Safeguard for the use of Bengali Language in Cachar :-**
Without prejudice to the provisions contained in Section 3, the Bengali language shall be used for administrative and other official purposes upto and including the district level in the district of Cachar.

খ। **Section 6. The use of English as official language in respect of examinations conducted by the Assam Public Service Commission :-**
Notwithstanding anything in Section 3, any examination held by the Assam Public Service Commission which immediately before the commencement of this Act used to be conducted in the English language shall continue to be so conducted till such time as the use thereof is permissible for the official purposes of the Union under any law made by the parliament in this behalf.

Provided that a candidate shall have the right to choose the language in use in the state of Assam, which was the medium of his University Examination.

The Assam Official Language Rules, 1970 এতে নিম্নোক্ত বিধিগুলি রয়েছে :—

ক। **3. Language of Representations, petitions and communications from people :-**

Representations for redress of any grievences, petitions and communications may be submitted by the people to the government in any language used in the State.

(1) Replies to such representations, petitions and communications received in any language shall be sent in Assamese in the Brahmaputra Valley districts

and in Bengali in the District of Cachar and in English in the Autonomous region or Districts, until such region or District adopt any other language.

(2) Replies from the State Secretariat and Heads of Department offices to representations, petitions and communications received in any language shall be sent in Assamese in the Brahmaputra Valley districts and in English in the District of Cachar and Autonomous and Regions.

খ। **5. Communications between the State and the districts :-**

(1) All communications between the State Secretariat, offices of Heads of Departments and offices in the Brahmaputra Valley Districts shall be in Assamese, and

(2) All such communications with offices in the Autonomous Districts, Autonomous Regions and Cachar shall be in English until replaced by Hindi as the official language of the union.

(কাছাড় বলতে সর্বত্রই বরাক উপত্যকা বোঝাবে)

<u>২৪শে জুলাই, ১৯৬৪ সালের বিজ্ঞপ্তি ঃ</u>

No PLB 19/63/146 --- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section I of the Assam Official Language Act. 1960, the Governor of Assam is pleased to appoint the 1st August, 1964, as the date on which the Assamese language in the Brahmaputra Valley Districts and the Bengali language in Cachar District (বরাক উপত্যকা) shall be used for all official purposes at the level of the Anchalik Panchayet, Development Blocks and Sub-Deputy Collectors circles while communicating with public and other offices of the same level.

<u>১৯৫৬ সালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্মারকলিপির ১১ নম্বর প্রস্তাব ঃ</u>

The Commission has further suggested that in districts of smaller areas like Municipalities and Tehsils where a linguistic minority constitutes 15 to 20 per cent of the population of that area, it may be an advantage to get important government notices and rules published in the language of the minority in addition to any other language or languages in which such documents may otherwise be published in the usual course.

পরিশিষ্ট-৭

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা : একটি অবলোকন

বরাক উপত্যকায় ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ১৯৬১, দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৭২ এবং তৃতীয় পর্যায় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের ভাষা আন্দোলনের যে ইতিহাস চর্চা এ পর্যন্ত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হল। এযাবৎ প্রকাশিত পুস্তক ও সংকলনের এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন ***ইমাদ উদ্দিন বুলবুল।***

১. মুখের ভাষা বুকের রুধির

রিপোর্তাজধর্মী এই বইটির রচয়িতা কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজারের বিশিষ্ট সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী। জন্মসূত্রে তিনি এই উপত্যকার লোক। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ভাষা সংগ্রাম চলাকালে তিনি উক্ত পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে শিলচর এসেছিলেন এবং ঘটনাবলীর তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ আনন্দবাজারে পাঠিয়েছেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'মুখের ভাষা বুকের রুধির'। বইটি বহুল পঠিত ও আলোচিত। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

করিমগঞ্জ থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ও দিলীপকান্তি লস্কর সম্পাদিত 'লালন মঞ্চ' গ্রন্থে বইটির পুনর্মুদ্রণ করা হয়। সম্প্রতি শিলচরের দৈনিক প্রান্তজ্যোতি উক্ত বইটি পত্রিকায় ধারাবাহিক পুনর্মুদ্রণ করে। ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রকাশিত পুস্তকাদির মধ্যে এটি প্রথম প্রকাশনা।

২. ভাষা সংগ্রামে কাছাড়

অভিজ্ঞতার নিরিখে ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস লিখেছেন অলক রায়। ডিমাই সাইজের বাঁধাই করা এই বইটি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত। এই পুস্তকটি একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে করিমগঞ্জে শহিদ বাচ্চু চক্রবর্তীর শহিদ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত। লেখকের আসল নাম বিপ্ররাজ দাস। তিনি করিমগঞ্জের বাসিন্দা। তাঁর অন্যান্য বিষয়েও রচনা আছে। তিনি প্রচার বিমুখ।

৩. ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস

বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সন্নিবেশিত করে শিলচরের সাংবাদিক ও ভাষা সংগ্রামী সনৎকুমার কৈরী এই বইটি প্রকাশ করেন ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে। ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস হিসেবে এই পুস্তকটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিলচর থেকে প্রকাশিত এই পুস্তকের কলেবর আশি পৃষ্ঠা ছিল। লেখক পরবর্তীতে অনেক নতুন তথ্যাবলী দিয়ে ১৮০ পৃষ্ঠার (ডিমাই সাইজ) গ্রন্থ লিখেন 'ভাষা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস'। এই গ্রন্থটি ১১ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে শিলচরের গান্ধীভবনে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বরাকের বহমান ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য লেখকের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সেদিনের অনুষ্ঠানে উপত্যকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থেকে লেখককে উৎসাহিত করেছিলেন। লেখক বর্তমানে দৈনিক শিলচর টাইমের (বাংলা) সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী।

৪. বরাক উপত্যকার ভাষা : সত্য ও তথ্য

বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা নিয়ে এক শ্রেণির অসমিয়া পণ্ডিতকুল অহেতুক নানা অবান্তর প্রশ্ন তুলেছিলেন। অসম সাহিত্য সভা এ ধরনের কাজে তাঁদের পণ্ডিতদের উৎসাহিত করে চলেছিল। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে অসম সাহিত্য সভা তাঁদের ৫৪তম অধিবেশন বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি শহরে আয়োজন করে। সেই অধিবেশনের প্রতিবেদন 'দ্য আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকার The Sabha in Retrospect নামক প্রতিবেদন প্রকাশকালে অসমিয়া প্রখ্যাত নাট্যকার ও অসম সাহিত্য সভার বিশিষ্ট নেতা সত্যপ্রসাদ বরুয়া বরাকের বাংলাভাষার অবস্থান সম্পর্কে যে সব বক্তব্য রেখেছিলেন, তা সত্যের অপলাপ মাত্র ছিল। এই বিভ্রান্তি ছড়ানোতে তখন আলগাপুরের বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী শহীদুল আলম চৌধুরীরও অবদান ছিল। উক্ত বরুয়া মহোদয়ের প্রতিবেদনটি উক্ত পত্রিকায় ৫ মার্চ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই অপপ্রচারের মোকাবেলায় বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এগিয়ে আসে। ড. সুজিৎ চৌধুরী লিখেন 'বরাক উপত্যকার ভাষা : সত্য ও তথ্য'। রচনাটি পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করেন উক্ত সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে করিমগঞ্জ থেকে। প্রকাশিত ডিমাই সাইজের বিশ পৃষ্ঠার রচনাটি ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নানা তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণে রচনাটি একটি আকর নিবন্ধ হিসেবে বিবেচিত। পরবর্তীতে ড. সুজিৎ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলন 'প্রবন্ধ একাদশ' (সম্পাদনা জয়দীপ বিশ্বাস)-এ ৬ নং প্রবন্ধ হিসেবে গ্রন্থিত হয়। গ্রন্থটি অক্ষর পাবলিকেশনস্ আগরতলা থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ড. সুজিৎ চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের উপর আলাদাভাবে কোন গ্রন্থ না লিখলেও তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ এই উপত্যকার ভাষিক অবস্থান বিশ্লেষণ করতে বিশেষ সহায়ক।

৫. দেশী ভাষা বিদ্যা যার

"দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ না যায়।"

সতের শতকের বিখ্যাত কবি আব্দুল হাকিমের ইতিহাস খ্যাত কবিতার একটি লাইনের চারটি শব্দ দিয়ে ইমাদ উদ্দিন বুলবুলের একটি পুস্তিকা, যা ২৮ মে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শিলচর মহকুমা পরিষদ সভাকক্ষে

(বর্তমান কাছাড় জেলা পরিষদ) কবি শ্রীমতী অনুরূপা বিশ্বাসের হাত দিয়ে এই উন্মোচন কর্মে তাঁর সহযোগী ছিলেন ভাষা সংগ্রামের শিলচর মহকুমার ডিক্টেটর পরিতোষ পাল চৌধুরী।

পুস্তিকাটিকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে বরাকের বাঙালি মুসলিমদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তিকাটি বহুল আলোচিত। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে দিলীপকান্তি লস্কর সম্পাদিত লালন মঞ্চের উভয় খণ্ডে পুস্তিকাটি হুবহু দুবার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁর সম্পাদিত 'উনিশে মে-র ইতিহাস ও ভারতে বাংলাভাষা সংগ্রাম একটি মূল্যায়ন প্রচেষ্টা' দুটি গ্রন্থে রচনাটি স্থান পায়। এই পুস্তিকার রচনাটি কলকাতা থেকে বাহার উদ্দিন সম্পাদিত 'আরম্ভ' সাময়িকীর ১৯ মে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস চর্চায় নিবেদিত এই সংকলনে সম্পাদক রচনার শিরোনাম বদল করে রেখেছেন 'প্রতিরোধ নয় ষড়যন্ত্র'। এই পুস্তিকায় প্রথমবারের মতো ৫৮টি দলিলের শিরোনাম ও টীকাসহ একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়।

৬. ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার

ইমাদ উদ্দিন বুলবুলের দুটি প্রবন্ধ দিয়ে ১৮ মে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই পুস্তিকা শিলচর থেকে প্রকাশিত হয়। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতি আয়োজিত গান্ধীভবনের আলোচনা সভায় পুস্তিকাটির মোড়ক উন্মোচন করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য তথা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য। পুস্তিকাটি বহুল প্রচারিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমীরকুমার দাস তাঁর প্রবন্ধ Ethnic Sub-Territoriality and the Modern State : The Case of North-Eastern India রচনাকালে পুস্তিকাটির সাহায্যে বরাক উপত্যকা বিষয়ক তাঁর সন্দর্ভ পেশ করেন; যা পরবর্তীতে International Relations In India; Theorising the Region and Nation (Orient Longman : 2005) গ্রন্থের ৩০৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থিত হয়। আবার অধ্যাপক সমীরকুমার দাসের প্রবন্ধ 'Situating the Self : Selfhood and Ethnicity in Contemporary North Eastern India' রচনাকালে বরাক উপত্যকা বিষয়ক সন্দর্ভ পেশ করতে গিয়ে উক্ত পুস্তিকাটি অবলম্বন করেন। ঐ সঙ্গে ড. সুবীর করের 'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস' ও দিলীপকান্তি লস্কর সম্পাদিত 'আসামে বাংলা ভাষার সংকট' গ্রন্থ দুটিরও সাহায্য নেওয়া হয়। প্রবন্ধটি পরবর্তীতে সি যশোয়া টমাস সম্পাদিত Polity & Economy গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়, যা নয়াদিল্লির রিজেন্সি পাবলিকেশনস্ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। বইটি গ্রন্থনার দায়িত্ব 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোসিয়েল সায়েন্স রিসার্চ, নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নেল সেন্টার' পালন করেন। উক্ত ইংরেজি গ্রন্থ দুটি ইন্টারনেটেও পড়া যায়।

৭. উনিশের উত্তরাধিকার

বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী অনন্ত দেবের বিশেষ উদ্যোগে 'উনিশের উত্তরাধিকার' নামে একটি সংকলন ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনায় ছিলেন অনন্ত দেব, মৃণালকান্তি দত্ত বিশ্বাস, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, তৈমুর রাজা চৌধুরী ও মিলন উদ্দিন লস্কর। সংকলনে মৃণালকান্তি দত্ত বিশ্বাস, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, ডাঃ মন্মথ দাস প্রমুখের সুচিন্তিত নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ মন্মথ দাস ১৯ মে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে শিলচর সিভিল হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। শহিদ ও অন্যান্য আহতদের চিকিৎসা করেন। ঐ সময়ে হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ আশুতোষ মুখার্জি ও সহযোগী হিসেবে ডাঃ মন্মথ দাস ও ডাঃ মোজাক্কির হুসেন ছিলেন।

শেষোক্ত দুজন পরলোকগত হলেও ডাঃ মন্মথ দাস শিলচর অম্বিকাপট্টিতে সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছেন। ভাষা আন্দোলন নিয়ে সম্ভবত এটাই প্রথম সংকলন। পরবর্তীতে অনেকের রচনায় সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. শতাব্দীর তথ্যপঞ্জি

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতক (১৩০১-১৪০০ বঙ্গাব্দ) বরাক উপত্যকার জীবনে কীরকম ছিল, সেই মননশীল প্রবন্ধ/ নিবন্ধ ও তথ্যাদি দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল একটি আকর গ্রন্থ 'শতাব্দীর তথ্যপঞ্জি' ১ম খণ্ড। ১/৪ ডিমাই সাইজের ১১৪ পৃষ্ঠার এই অতি মূল্যবান গ্রন্থের সম্পাদনায় ছিলেন বিজিৎ চৌধুরী, বিজয় ধর, সুবীর কর, অনুরূপা বিশ্বাস, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী ও নীতিশ ভট্টাচার্য (আহ্বায়ক)। তথ্যপঞ্জিটি বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি শিলচর কর্তৃক ২১ জুলাই ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ভাবী প্রজন্মের হাতে উৎসর্গিত।

এতে 'ভাষা আন্দোলনের রূপরেখা' এই শীর্ষকে অধ্যাপক সুবীর কর একটি দীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লিখেন, যাতে আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটিতে কামালুদ্দীন আহমদ লিখেন 'বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকে সুরমা-বরাক', অনুরূপা বিশ্বাস লিখেন 'প্রসঙ্গ : বরাক উপত্যকায় শিক্ষা বিস্তার', জন্মজিৎ রায় লিখেন 'বাংলা সাহিত্যচর্চার একশ বছর', এ কে মতীন আহমদ বড়লস্কর ও অতীন দাশ যুগ্মভাবে লিখেন 'বরাক উপত্যকার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা'। গ্রন্থটিতে ১ম খণ্ড লেখা থাকলেও পরবর্তীতে দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয়নি।

৯. বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ড° সুবীর কর লিখেন —'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস।' প্রণালীবদ্ধভাবে ইতিহাস রচনার এই সাফল্য এককভাবে ড° সুবীর করের প্রাপ্য। অবশ্য গ্রন্থটি রচনাকালে প্রখ্যাত সাংবাদিক হুরমত আলি বড়লস্করের সংরক্ষিত দলিল দস্তাবেজ প্রভূতভাবে তাঁকে সাহায্য করেছে, যা তিনি গ্রন্থে স্বীকারও করেছেন, গ্রন্থটি দেশে-বিদেশে বহুল পঠিত, ২৭২ পৃষ্ঠার এই মূল্যবান গ্রন্থটি ২১ জুলাই ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে শিলচর গান্ধীভবনে উন্মোচিত হয়েছিল, কলকাতার পুস্তক বিপণি ছিল এর প্রকাশক, অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। বর্তমানে ২য় সংস্করণ প্রকাশের অপেক্ষায়।

১০. রক্তাঞ্জলি

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন পরিতোষ পালচৌধুরী। সংগ্রাম চলাকালীন তৎকালীন শিলচর মহকুমায় (বর্তমান কাছাড় জেলা) মহকুমা সমিতিতে অচলাবস্থা দেখা দিলে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁকে শিলচর মহকুমার জন্য 'ডিক্টেটর' (একনায়ক) ঘোষণা করেন। তাঁরই নেতৃত্বে শিলচর মহকুমায় ভাষা আন্দোলনের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রামের একজন নেতা হিসেবে তিনি তাঁর দেখা ঘটনাবলিকে প্রণালীবদ্ধভাবে সাজিয়েছেন। সেই সুন্দর প্রচ্ছদযুক্ত গ্রন্থটি ২৫

ডিসেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দে শিলচর বইমেলায় প্রকাশিত হয়। উন্মোচন করেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার তৎকালীন মহাপরিচালক হারূন হাবীব। গ্রন্থটিও তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত। বহুল প্রচারিত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়।

১১. লালন মঞ্চ

বরাক উপত্যকার বহমান ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে ইতিহাসের উপাদান রচনায় সর্বস্বপণ করে এগিয়ে আসেন করিমগঞ্জের লালন মঞ্চের সম্পাদক দিলীপকান্তি লস্কর। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে কয়েকজন সহযোগী নিয়ে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে নামেন। আমাদের অঞ্চলে তখনকার দিনে আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রের অপ্রতুলতা এবং প্রকাশনার ব্যাপারে নিজস্ব কিছু ভুল সিদ্ধান্তের ফলে তাঁর ঘোষিত সংগ্রামের ইতিহাস প্রকাশে অনেক বিলম্ব ঘটতে থাকে। এই প্রকাশনা করতে গিয়ে তিনি চূড়ান্তভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন। অবশেষে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে ১৯মে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে লালন মঞ্চের ভারতে বাংলাভাষার সংগ্রাম 'শহিদ স্মরণ সংখ্যা' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলনের সংখ্যা দুটি শহিদ দিবসের সন্ধ্যায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের দ্বারা আয়োজিত শিলচর জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহের হল ভর্তি দর্শকদের সামনে ড° ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের দ্বারা গ্রন্থটি উন্মোচিত হয়।

এই সংকলনের ১ম খণ্ডে ৭৬০ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৫০০ পৃষ্ঠা ডিমাই সাইজের ছিল। পরবর্তীতে এই সংকলন দুটি থেকে সংগৃহীত রচনাগুলো দিয়ে সাতটি গ্রন্থ দিলীপকান্তি লস্করের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

এগুলো হল ঃ

১) **উনিশের ভাষা শহিদেরা**
ভাষা শহিদদের জীবনী ও তাঁদের বিষয়ে আলোচনা।

২) **উনিশে মে'র ইতিহাস**
১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস।

৩) **ভারতে বাংলা ভাষা সংগ্রাম : ৭২-৮৬**
বরাক উপত্যকায় ১৯৭২ এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস।

৪) **ভারতে বাংলাভাষা সংগ্রাম : একটি মূল্যায়ন প্রচেষ্টা**
ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন সম্বলিত প্রবন্ধ।

৫) **আসামে বাংলা ভাষা সংকট**
আসাম রাজ্যে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ও বিভিন্ন মাত্রিক সংকটের বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ ইত্যাদি।

৬) **উনিশের কবিতা ও গান**
উনিশে মে-কে নিয়ে কবিতা ও গানের সংগ্রহ।

৭) **উনিশের কথা সাহিত্য**
উনিশে মে-কে নিয়ে গল্প উপন্যাস ইত্যাদির সংকলন।

লালন মঞ্চের দিলীপকান্তি লস্করের এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে বরাকের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐ সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থগুলোর প্রথম সংস্করণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য সম্পাদক আগামীতে চেষ্টা করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

১২. ভারতে বাংলাভাষা সংগ্রাম

ভাষা আন্দোলনের প্রণালীবদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছেন শিলচরের কানু আইচ। মূল্যবান এই গ্রন্থটিতে লেখক বিশেষ ঘটনাবলিকে এমন ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যা সচরাচর এ ধরনের গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থটিতে ৩১৮ পৃষ্ঠা আছে, যা ১৭ আগস্ট ২০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার জন্য বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি শিলচর এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এগিয়ে আসে। তাঁদের চেষ্টায় গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ ১৭ আগস্ট ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বেশকিছু মূল্যবান দলিলের ছবিও ছাপানো হয়েছে, যা গ্রন্থটিকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। লেখকের বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করলেও একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার যে আগামী দিনের গবেষকদের জন্য তা নতুন নতুন আলোচনা ও গবেষণার দ্বার খুলে দেবে।

১৩. বাংলা ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য

পশ্চিমবঙ্গের লেখক অধ্যাপক সুকান্ত পাল তাঁর দশটি প্রবন্ধ দিয়ে কলকাতা বইমেলায় ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'বাংলা ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য' পুস্তকটি। ডিমাই ৪৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটি হার্ড বাঁধাই করা।

এই পুস্তকে বরাকের ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোলে ধরা হয়েছে। ঐ সঙ্গে ২ জুলাই ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের দ্বারা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর নিকট দাখিল করা স্মারকলিপির অনুলিপিও পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে। বরাকের ভাষা আন্দোলনের উপর প্রকাশিত পুস্তকের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সম্ভবতঃ এটি প্রথম পুস্তক। লেখক অত্যন্ত পরিশ্রম করে এই পুস্তক প্রকাশ করেছেন। পুস্তক ২১ ফেব্রুয়ারির কথাও পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. উনিশের কোলাজ

১৯মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে শিলচর থেকে সম্পাদিত জ্যোৎস্না হোসেন চৌধুরী ও সহ সম্পাদক মিলন উদ্দিন লস্কর কর্তৃক প্রকাশিত একটি ছোট্ট সংকলন 'উনিশের কোলাজ'। প্রকাশনায় জ্যোতি প্রকাশনা ,মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা শিলচর-২, ডিমাই বিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় লেখক হিসেবে নিরঞ্জন রায়চৌধুরী ওরফে শংকর রায়চৌধুরী, মাশুক আহমদ, আশিস নাথ ও ইমাদউদ্দিন বুলবুল। কবিতা সংকলিত হয়েছে অনুরূপা বিশ্বাস, দিলীপকান্তি লস্কর, লুৎফাআরা চৌধুরী, নইমুল ইসলাম চৌধুরী,দীপ্তি চক্রবর্তী, তুষারকান্তি নাথ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, স্মৃতিপাল নাথ।

নিরঞ্জন রায় চৌধুরীর 'ভাষা সংগ্রামের দিনগুলি' এবং আশিস নাথ রচিত 'একুশের দেশে আমাদের উনিশ' খুবই মূল্যবান প্রবন্ধ। এই সংকলনে ড° মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র সেই বিখ্যাত উক্তি সংকলিত হয়েছে, যা তিনি ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন—

"আমরা হিন্দু মুসলমান যেমন সত্য,তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটা কোন আদর্শের কথা নয়। এটা একটি খাঁটি কথা। প্রকৃতি নিজ হাতে আমাদের চেহারায় এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যা মালা-তিলক -টিকিতে বা টুপি লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।"

১৫. মায়ের ভাষা

পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত থেকে তাহমিনা খাতুনের সম্পাদনায় সুরম্য সংকলন 'মায়ের ভাষা'২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি শক্ত বাঁধাই এবং ডিমাই সাইজ ২০০ পৃষ্ঠা।

এই সংকলনে বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রাম বিষয়ক পরিতোষ পালচৌধুরী ও ইমাদ উদ্দিন বুলবুলের দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সংকলিত করা হয়েছে। সংকলনে উনিশ-একুশের ভাষা সংগ্রাম একাকার হয়ে আছে। বহুল পঠিতও সংরক্ষিত এই সংকলনটি খুবই তথ্যনিষ্ঠ হিসেবে আদৃত হয়েছে।

১৬. অমৃতলোক - উনিশে মে সংখ্যা (সাময়িকী)

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত লিটিল ম্যাগাজিন 'অমৃতলোক'-এর কথা বোদ্ধা সাহিত্য পাঠকদের কাছে খুবই পরিচিত।

বরাক উপত্যকার সাহিত্যপ্রেমীদের সহযোগিতায় অমৃতলোক সম্পাদক সমীরণ মজুমদার ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'অমৃতলোক উনিশে মে সংখ্যা'। এই সংকলনে ২০০ পৃষ্ঠা জুড়ে ড° তপোধীর ভট্টাচার্যের 'নিভন্ত চুল্লিতে একটু আগুন দে মা' এবং ইমাদ উদ্দিন বুলবুলের 'ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রভাব' প্রবন্ধ দুটি ছাড়াও আন্দোলনের নানা খুটিনাটি বিষয় প্রকাশিত হয়েছে।

(এই বিবরণ লেখার সময় উল্লিখিত বিশেষ সংখ্যা হাতের কাছে না পাওয়ায় বিস্তারিত লেখা গেল না)।

১৭. উনিশে মে : চেতনার নির্ঝর

তুষারকান্তি নাথ বরাক উপত্যকার একজন গবেষক। তাঁর রচনায় অনেক খুঁটিনাটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে উঠে আসে, তাঁর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ দিয়ে মে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে জাতিঙ্গা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করেন 'উনিশে মে : চেতনার নির্ঝর'।

এই পুস্তিকায় তাঁর চারটি প্রবন্ধ, যথা— 'বরাক উপত্যকার সাহিত্যে উনিশে মে'র প্রভাব', 'উনিশ -একুশের চেতনা ও আশির দশকে গ্রামাঞ্চলের ক'টি লিটল ম্যাগাজিন', 'উনিশ এখন একুশের দেশে', 'ভাষা আন্দোলনের চেতনা : গাঙ্গেয় উপত্যকায়' গ্রন্থিত হয়েছে, তাঁর প্রবন্ধগুলো তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে খুবই মৌলিক। আগামী দিনের গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করবে। বইখানি প্রায় নিঃশেষিত।

১৮. বরাক উপত্যকার বহমান ভাষা আন্দোলন

১১ নভেম্বর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে করিমগঞ্জের নিলোজ প্রকাশনী থেকে ডিমাই ৮৮ পৃষ্ঠার এই সংকলন প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন প্রখ্যাত ভাষা সংগ্রামী ও বারক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী ও ভবতোষ দাস।

এই সংকলনে নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, সুজিৎ চৌধুরী, ড° কামালুদ্দীন আহমেদ, পরিতোষ পালচৌধুরী, সতু রায় ও মাধবেন্দ্র দত্তচৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী ও সুজিৎ চৌধুরীর দুটি করে প্রবন্ধ আছে। প্রচ্ছদে করিমগঞ্জের শম্ভুসাগর পার্কে নির্মিত শহিদ স্মৃতিসৌধ অত্যন্ত মনোরম হওয়ায় সংকলনটির

সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত মূল্যবান ও আগামী দিনের গবেষকদের গবেষণা কার্যে প্রভূত সাহায্য করবে।

১৯. প্রসঙ্গ : উনিশে মে বাংলা ভাষা ও অন্যান্য

বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট সাংবাদিক আশিসরঞ্জন নাথ সবসময় নানা বিষয়ে লিখে চলেছেন। তাঁরই প্রকাশিত পাঁচটি প্রবন্ধ দিয়ে মে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবাহ প্রকাশনী লালা থেকে প্রকাশিত হয় — 'প্রসঙ্গ : উনিশে মে বাংলা ভাষা ও অন্যান্য'। ডিমাই সাইজের ৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থিত হয়েছে (১) বাংলা কবিতায় বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের প্রভাব, (২) গণতান্ত্রিক লেখক সমন্বয় ও বরাক উপত্যকার সাহিত্যচর্চা, (৩) বাংলা ভাষার এই নিদেন দিনে 'রাই জাগো' গান গাইবে কে?, (৪) আসামে বাধ্যতামূলক মাতৃভাষা ও বাংলা মাধ্যম স্কুলের বাস্তব দশা, (৫) বিষয় : বিজ্ঞাপন এবং প্রাসঙ্গিক কিছুকথা। রচনাগুলো খুবই মৌলিক, ১ম সংস্করণ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে।

২০. ভাষা সংগ্রামের উৎস সন্ধানে এবং অন্যান্য

সাংবাদিক ও কবি বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রথম পুস্তক 'ভাষা সংগ্রামের উৎস সন্ধানে ও অন্যান্য'। এই পুস্তকটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক শিল্পী প্রকাশনী শিলচর-৫। ৯২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন সময়ে লিখিত নিবন্ধ ও রিপোর্তাজ সংকলিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থেই ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময় মইনুল হক চৌধুরীর ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে।

২১. আরম্ভ : অমর উনিশে মে (সাময়িকী)

কলকাতা থেকে কবি সাংবাদিক বাহার উদ্দিনের সম্পাদনায় 'আরম্ভ' সাময়িকীর ১৯ মে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল -- অমর উনিশে মে। এতে সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী, ঋষিণ মিত্র, সন্তোষ মোহন দেব, সুজিৎ চৌধুরী, ড° তপোধীর ভট্টাচার্য, আবুল হোসেন মজুমদার, ইমাদ উদ্দিন বুলবুলের প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। ঐ সঙ্গে ভাষা শহিদদের ছবিও ছাপা হয়েছিল। সংকলনটির মূল্য ছিল পঞ্চাশ টাকা। উল্লেখযোগ্য যে কবি বাহার উদ্দিনের জন্মবাড়ি হাইলাকান্দিতে অবস্থিত।

২২. বাংলাভাষা আন্দোলন ও যুগশক্তি (১৯৬০-৬১)

বরাকের ভাষা আন্দোলনে সাপ্তাহিক যুগশক্তি পরিবারের অবদানের কথা সর্বজন স্বীকৃত। এই পরিবারের প্রাণপুরুষ বিধুভূষণ চৌধুরী কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের একজন নেতা ছিলেন। তাঁর পুত্রগণও সেই আন্দোলনের সক্রিয় ছাত্র নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর মধ্যে বিজিৎ চৌধুরী, ড° সুজিৎ চৌধুরী, রবিজিৎ চৌধুরী, সমরজিৎ চৌধুরী সমাজে বহুল পরিচিত। বিধুভূষণ চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক যুগশক্তি পত্রিকায় বাংলা ভাষা আন্দোলনের রিপোর্ট ও সম্পাদকীয় ঐ সময়ে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বিধুভূষণ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ

স্বরূপ তাঁর সুযোগ্য সন্তানগণ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশ করেন 'বাংলা ভাষা আন্দোলন ও যুগশক্তি (১৯৬০-৬১)' নামক সংকলন গ্রন্থ। সংকলনটি সম্পাদনা করেন ঐ সময়ে যুগশক্তির সম্পাদক সমরজিৎ চৌধুরী। ডিমাই সাইজের ১৪৮ পৃষ্ঠার এই সংকলনটি আগামী দিনের গবেষকদের কাছে যে কত মূল্যবান আকর হিসেবে বিবেচিত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঐ সময়ে বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য সাপ্তাহিক যথা অরুণোদয়, যুগশঙ্খ, আজাদ, ইত্যাদিতেও প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় সংকলিত করে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্যাদি এভাবে প্রকাশ করা হলে আগামী দিনের গবেষকদের জন্য অনেক উপকার হবে।

২৩. ১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্ব সংকট

কবি প্রাবন্ধিক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের পূর্ব প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধকে গ্রন্থিত করে এই পুস্তিকা ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। মৌলিক চিন্তার জন্য খ্যাত এই প্রাবন্ধিকের রচনাবলি আগামী দিনের গবেষকদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।

২৪. ১৯শের খোঁজে : বরাক উপত্যকার বাংলাভাষা সংগ্রাম এবং অন্যান্য

বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত এই গ্রন্থের রচয়িতা কবি-সাংবাদিক বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। এটি তাঁর এ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তক। ২১ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দে শিলচরের শিল্পী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। ডিমাই সাইজের ৯২ পৃষ্ঠার এই পুস্তক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর অনেকটি রচনা গ্রন্থিত হয়েছে। আগামী দিনের গবেষকদের জন্য এই পুস্তক খুবই সহায়ক হবে।

২৫. শনিবার : উনিশের বাংলা ভাষা শহিদ স্মরণে (সাময়িকী)

আমাদের পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে এমন কত বাঙালি বাস করেন যারা বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের কথা জানতে আগ্রহী। এজন্য ক'জন মানুষ তাদের জানাবার সেই দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নেন। আর তাঁদের প্রচেষ্টায় কানাডার মন্ট্রিল নগরী থেকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'শনিবার : উনিশের বাংলা ভাষা শহিদ স্মরণে বিশেষ সংখ্যা।' ম্যাগাজিন সাইজের ৪২ পৃষ্ঠার এই সংকলনে সংগ্রহ ও সংকলিত করার দায়িত্ব পালন করেন লণ্ডনের বাসিন্দা শিলচরের সন্তান রণেন দাম। সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন মন্ট্রিলের উক্ত সাময়িকীর সম্পাদক বনমালী চৌধুরী। মুদ্রণে ছিলেন কলকাতার জীৎরাজ অফসেটের মালিক শিলং-এর সন্তান দেবব্রত চৌধুরী। এই সংকলনের রচনা সংগ্রহে সুমিত্রা দত্ত, ড° তপোধীর ভট্টাচার্য, অনুরূপা বিশ্বাস ও অঞ্জু এন্দো সাহায্য করেছেন। সংকলনে বরাক উপত্যকার ২৯ জন কবি-লেখকের রচনা মুদ্রিত কিংবা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তন্মধ্যে অনুরূপা বিশ্বাস ড° সুবীর কর, ড° তপোধীর ভট্টাচার্য, সুমিত্রা দত্ত, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, অঞ্জু এন্দো, ডাঃ লক্ষীনারায়ণ রায়, চামেলী কর, মন্দিরা দত্ত, লুৎফা আরা চৌধুরী, আশিস রঞ্জন নাথ, বনফুল, মহুয়া চৌধুরী, নাজিম উদ্দিন আহমেদ, বাহার উদ্দিন চৌধুরী, স্বরূপা ভট্টাচার্য, জিতেন পাল, স্নিগ্ধা নাথ, অম্বুজা দত্ত, কাব্যশ্রী বকসী, কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শুভব্রত বন্দোপাধ্যায়, সীতাংশু বিশ্বাস, ড° সুতপা ভট্টাচার্য ও রণেন দাম আছেন। প্রচ্ছদে বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে লালে লাল হয়ে পাঠকদের আকৃষ্ট করছে, আর শহিদের রক্তলাল আত্মত্যাগের

কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

এই সংকলনে ভাষা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন লেখকের কলমে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই সংকলন হচ্ছে বরাক উপত্যকা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান থেকে প্রকাশিত উনিশে-মের ইতিহাস চর্চা বিষয়ক সংকলন। আমাদের সঙ্গে মন্ট্রিলের সময়ের ব্যবধান পুরো বারো ঘন্টা, অর্থাৎ আমাদের রাত দশটা আর মন্ট্রিলে তখন সকাল দশটা। খরচা বাঁচাতে কলকাতা থেকে মুদ্রিত করে বিমানে কানাডা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর সেখানে এই সংকলনের কী চাহিদা। হাতে হাতে ছয়শত কপি বিক্রি হয়ে যায় এবং কানাডা ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের এই আত্মত্যাগের বার্তা বিশ্বাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাতৃভাষার প্রতি দায়বদ্ধ জনগণের অবারিত কৃতজ্ঞতা সংকলনের দায়িত্বে থাকা সকলের প্রতি রয়েছে।

২৬. মে ওয়ান লাইন

বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক সালাম আজাদ দিল্লিতে অবস্থানকালে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে লিখেন একটি ইতিহাস অবশ্রিত উপন্যাস মে ওয়ান লাইন। সুখপাঠ্য ইংরেজিতে লিখিত এই উপন্যাসের প্রকাশক দিল্লির একটি প্রকাশনী। প্রকাশনা কাল ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

আবার এই একই গ্রন্থ বাংলায় লেখক সালাম আজাদ একই বছরে ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন। বিশ্ববাসীর কাছে উনিশের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রন্থ দুটি সহায়ক হবে।

২৭. আসামে বাংলাভাষা আন্দোলন

৩২ পৃষ্ঠার এই সুরম্য পুস্তিকাটি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন স্মৃতি রক্ষা পরিষদ ঢাকা কর্তৃক ১৯ মে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন মোহাম্মদ আজাদ, আখতারুন নাহার আলো এবং এম আর মাহবুব। সংকলন পুস্তিকাটিতে মোহাম্মদ আসাদ, সুলতানা রিজিয়া, আখতারুন নাহার আলো এবং এম আর মাহবুবের নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। এছাড়াও পুস্তিকাটিতে শহিদগণের পরিচিতি অত্যন্ত যত্ন সহকারে ছাপানো হয়েছে। বইটিতে কিছু তথ্যগত ত্রুটি ধরা পড়ায় এই নিবন্ধকার তা সংশোধন করে দেন এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুদ্ধ করা হবে বলে সম্পাদক আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন বরাকের ভাষা আন্দোলন নিয়ে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা পরবর্তীতে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'নির্ভয় করো হে' গ্রন্থে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সন্নিবেশিত করেছেন। বাংলাদেশের ঢাকার অধ্যাপক মেসবাহ কামালের সম্পাদনায় ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সমাজ চেতনা' পত্রিকার একটি বিশেষ সংকলন বাংলাদেশে উনিশের ইতিহাস পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল, সংকলনটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন আরশাদ সিদ্দিকি।

২৮. বরাকের ভাষা সংগ্রাম

ক্রাউন বুক সাইজের ৩২ পৃষ্ঠায় এই পুস্তিকাটির রচয়িতা সাংবাদিক অতীন দাশ। বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ দিয়ে এই পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধগুলো যথাক্রমে -- বরাকের ভাষা সংগ্রাম : প্রসঙ্গ কথা, উনিশের মূল্যায়ন, ভাষা দ্বন্দ্ব : অতীত ও বর্তমান, একুশের স্মৃতি। এ ছাড়াও পুস্তিকাটিতে শাস্ত্রী ফর্মুলার ইংরেজি বয়ান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং এ উপলক্ষে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ সচিব কোফি আন্নানের ২১ ফেব্রুয়ারি

২০০০ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত বার্তার ইংরেজি বয়ান জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকেই একমত হতে পারেন নি। তবুও আগামীদিনে এসব ঘটনাবলির আরও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হবে, এটা কাম্য।

উপসংহার

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসচর্চায় স্থানীয় পত্রিকাগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এবং বর্তমানেও রেখে চলেছে। তবে কোনও কোনও নামজাদা দৈনিকের পাতায় ১৯ মে শহিদ দিবসে কোন বিশেষ রচনা থাকে না, কোন শহিদ দিবসে পুরনো রচনা দায়সারাভাবে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। এসব মাতৃভাষা প্রেমিকদের কাছে পীড়াদায়ক বলে অনুভূত হয়। আবার কোনও কোনও দৈনিক সাধ্যমত উনিশের ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে থাকে। এ ছাড়াও বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সংবাদপত্র, আকাশবাণী শিলচর, দূরদর্শন কেন্দ্র শিলচর সাধ্যমত ইতিহাসচর্চা করে থাকে। অনুরূপা বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন বরাক উপত্যকা নন্দিনী সাহিত্য, ভবানী চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র, মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি, তারাপুরের স্টেশন রোড শহিদ স্মরণ কমিটি প্রায় প্রতিবছর তাঁদের স্মরণিকায় ব্যাপকভাবে উনিশের ইতিহাসচর্চা করে থাকেন। সময়াভাবে এসব কিছু প্রণালীবদ্ধভাবে এই রচনায় গ্রথিত করা গেল না। আরেকটি কথা, এই উপত্যকার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে গত শতাব্দীর আটের দশকে অনেক লিটল ম্যাগাজিনও এই ইতিহাসচর্চায় এগিয়ে আসে যা আগামীতে সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। লিটল ম্যাগাজিনগুলি হল -- কলিযুগ, খেলাঘর, চম্পাকলি, প্রবাহ, অনির্বাণশিখা।

এই অবলোকনে কোন কোন পুস্তক এবং সংকলন সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে কম বিবরণ এই রচনায় নথিবদ্ধ করা হয়েছে, তা নেহাৎ অনিচ্ছাকৃত। কারণ এই রচনাকালে অনেক পুস্তক এবং সংকলন হাতের ধারে পাওয়া যায়নি; তাই স্মৃতি থেকে বয়ান লিপিবদ্ধ করেছি। বেশি স্মৃতিনির্ভর হলে ভুলের মাত্রা বাড়তে পারে, যা ইতিহাসচর্চার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেছি। ◆

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
দিলীপকান্তি লস্কর, তুষারকান্তি নাথ, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, মিলন উদ্দিন লস্কর।

১৯শের কবিতা সংকলন

☞ বাংলাভাষার শহীদদের স্মৃতি সঙ্গীত : আলাউদ্দিন খাঁ, ☞ সাবাস কাছাড়বাসী : চারণ কবি, ☞ সত্যাগ্রহী জজসাহেব : চারণ কবি, ☞ রুদ্রবিষাণ : অগ্নিবাণ, ☞ আমার কণ্ঠস্বর (১৯৮৬), সন্দীপ দ্বীপের গল্প (১৯৮৮), ধর্মসংকট (২০০০), হে আমার দর্পণে বিম্বিত মুখ (২০০০), আলোর শৈশব (২০০১) : বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। ☞ দুঃখিনী বর্ণমালা কবিতাপুরুষ : পীযূষকান্তি দাস (১৯৮৬), ☞ কবিতা আমার শহীদ মিনার : জালাল উদ্দিন লস্কর (১৯৮৯), ☞ ইচ্ছের কুঁড়ি : তুষারকান্তি নাথ (১৯৮৯), ☞ উনিশে মে আয়ুষ্মান হও : অনুরূপা বিশ্বাস (১৯৯৪), ☞ তেমন রাবার নেই মোছে উনিশে মে : করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯৯৪), ☞ মাতৃভূমি বাংলা ভাষা মা : দিলীপকান্তি লস্কর (১৯৯৬), ☞ ভাষা শহিদের নবপুরাণ : স্মৃতি পাল নাথ (২০০৮)।

পরিশিষ্ট-৮

উনিশে মে সম্পর্কিত ক্যাসেট ও তথ্যচিত্র প্রকাশনা

উনিশে মে মহান ভাষা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে প্রথম যে ক্যাসেট তৈরি করা হয়, তার নাম 'দুঃখিনী বর্ণমালা'। এটি সম্পাদনা করেন এবং এতে কণ্ঠ দেন বিশ্বতোষ চৌধুরী ও মনোজ দেব। কলকাতার ইনরেকো ক্যাসেট কোম্পানি দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং উনিশে মে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীবাগে দুপুরের অনুষ্ঠানে তা' আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়। উন্মোচন করেন মৃণালকান্তি দত্ত বিশ্বাস। এই ক্যাসেট আবৃত্তি করেছিলেন মৃণালকান্তি দত্ত বিশ্বাস, নিলু সেনগুপ্ত ও দীলু ধর।

২০০০ খ্রিস্টাব্দের উনিশে মে তারিখে তিনটি ক্যাসেট প্রকাশ করা হয় :

শিলচরের সাংস্কৃতিক সংস্থা আনন্দমের প্রথম নিবেদন 'বুকের রক্তে লিখে গেল যারা মাতৃভাষার নাম'। যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনা : কানাইলাল দাস। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

শিলচরের তুষারকান্তি নাথ ও মিলন উদ্দিন লস্করের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কবিতার ক্যাসেট 'উনিশের কবিতা'। মূল্য : ত্রিশ টাকা।

শিলচরের বিবেক আচার্যের সম্পাদনায় ও সাখাওয়াত মজুমদারের সম্পাদনায় উনিশে মে সম্পর্কিত কবিতা ও গানের ক্যাসেট 'তোমার আমার ঠিকানা' প্রকাশিত হয়। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

২০০১ খ্রিস্টাব্দের উনিশে মে আরও দুটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়। শিলচরের মৈত্রেয়ী সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রকাশিত ক্যাসেটের নাম 'উনিশ স্মরণে'। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা।

কলকাতার কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের প্রযোজনায় সাহিত্য সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের বলিষ্ঠ নিবেদন '১৯ কবে ২১ হবে'। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

শিলচর থেকে আরেকটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়, যার নাম 'শহিদ বাংলা'। গীতিকার কবি বিমলকান্তি দাস ও শিল্পী -- নেহাল কুমার। ক্যাসেটে উনিশের গান দিয়ে ২০০২ সালে তৈরি।

কলকাতার এসটিএম ক্যাসেট কোম্পানি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে '১৯শে মে দুটো পঁয়ত্রিশ' নামে একটি ক্যাসেট প্রকাশ করে। শিলচরে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

কলকাতার কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত আরও একটি ক্যাসেট প্রকাশ করেন 'ভাষা সংগ্রাম' নাম দিয়ে। এটি দ্বিভাষিক অর্থাৎ বাংলা এবং হিন্দি।

২০০৬ সালে মিলন উদ্দিন লস্কর ও তুষারকান্তি নাথের সম্পাদনায় 'বরাক-সুরমা' কবিতা আবৃত্তির অডিও সিডি ও অডিও ক্যাসেট বের হয়। এটি প্রযোজনা করেন ভাষা সংস্কৃতি অকাদেমি অসম-এর মহাপরিচালক রেদাউল হোসেন খান। ভারত-বাংলাদেশের কবিদের উনিশ-একুশের কবিতা এতে স্থান পেয়েছে।

কয়েক বছর পূর্বে হাইলাকান্দি থেকে উনিশে মে সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র প্রস্তুত করা হয়। তথ্যচিত্রটি সিডিতে পাওয়া যায়।

গত বছর শিলচরের মামিয়া মুখার্জি, তাঁর পিতা অসিত ভট্টাচার্য ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় 'উনিশ' নামে একটি খুবই মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র তৈরি করেন।

এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, কারণ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আরও অনেক সিডি ও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়তো হয়েছে। আমরা অবগত হলে ভবিষ্যতে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করব। ◆

শিরোনামে একষট্টির ভাষা আন্দোলন

ট্রপিক পেন্ট
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ

যুগান্তর
JUGANTAR

সত্যাগ্রহী তরুণীদের আদালত দখল

কৃষিজীবী উদ্বাস্তুগণকে

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় পুনর্বা

একষট্টির অমর ভাষা সংগ্রামের দিনগুলোর ঘটনাপ্রবাহ দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলোর শিরোনামে উঠে এসেছিল। বাইরের বিশিষ্ট সাংবাদিকরা আন্দোলনের কর্মসূচিগুলো কভার করার জন্য শিলচর ছুটে আসেন। তাদের পাঠানো সংবাদের সঙ্গে আন্দোলনের বিশেষ মুহূর্তগুলোর ছবি তুলে ধরার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছিলেন শিলচরের প্রয়াত রসময় ভট্টাচার্য। স্থানীয় স্টুডিও মিতালির তৎকালীন কর্ণধার ভট্টাচার্যের বহু ছবি সেসময় বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়। আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন যে কতটা ব্যাপক ছিল ওইসব ছবি থেকে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

পল্লীকবির ১৯শের স্মৃতি সংগীত

জয় মা জয় ভাষার জয় গানও গাই।
ভাষার তরে কাছাড় জিলায় এগার জন শহীদ ভাই।।
১৯শে মে শুক্রবারে বেলা দু ঘটিকার পরে।
বাঙ্গালিয়ে হরতাল করে, বাংলা ভাষার দাবী চাই।।
লক্ষ লক্ষ নরনারী, স্কুল কলেজ বন্ধ করি।
বাংলা ভাষার দাবী করি, সরকারকে জানাইলেন ভাই।।
সরকারের না ছিল মতে, বাংলা ভাষার দাবী দিতে।
কোর্ট কাছারী পোষ্ট অফিস, বন্ধ না করিল ভাই।।
দলে দলে যাত্রা করে, পিকেটিং করিল সবে।
কোর্ট কাছারী বন্ধ কর, মাতৃভাষার দাবী চাই।।
শত শত সত্যাগ্রহী, হাতে জয় নিশানও ধরি।
শিলচরেরি রেলস্টেশনে, আগুয়ান হইল ভাই।।
রেল লাইনেরি দুই পাশে, সত্যাগ্রহী রইল বসে।
সে কারণে রেলের চাকা, ঘোরিতে নারিল ভাই।।
লাঠি ছটা গ্যাস ছাড়িল, (তবো) সত্যাগ্রহী না কাপিল।
জেলে গেল মাইর খাইল, কাছাড়ের সন্তান ভাই।।
মিলিটারী ভাই গুলি ছাড়ে, সত্যাগ্রহীর উপরে।
তবু তারা না সরিল, শহীদগণের নাম জানাই।।
সুকোমল, তরণী, কানাই, চণ্ডিচরণ, হিতেশ, জানাই।
সত্যেন্দ্র, বীরেন্দ্র, কুমুদ, শচিন্দ্র আর সুনীল নাই।।
দশ ভাই এক ভগ্নি, কমলায় দিলেন প্রাণি।
রক্ত দিল প্রাণ ত্যজিল, ভাষারি কারণে ভাই।।
(প্রায়) চল্লিশ লক্ষ নরনারী মিলে, নিরবে শব যাত্রা করে।
শ্মশানে সৎকার করে হিন্দু মুসলমানে ভাই।।
শুধু অহম ভাষা কেন থাকবে।
অন্য অন্য ভাষা থাকবে, সংবিধানের মতে ভাই।।
এগার জন শহীদ হইল, ভাষার জন্যে প্রাণ ত্যজিল।
কবি আলাউদ্দীন বলে, শহীদ বংশ উর্দ্ধে ঠাই।।
কি বলিব দুঃখ ভারি, শহীদের প্রার্থনা করি।
হিন্দুকে প্রণাম বলি, মুসলিমকে ছালাম ভাই।।

শহীদ জন্মে যার বংশে, উর্দ্ধে তাদের স্থান।
এমন মৃত্যু যার ঘরে তারাই ভাগ্যবান।

— মোঃ আলাউদ্দিন খাঁ